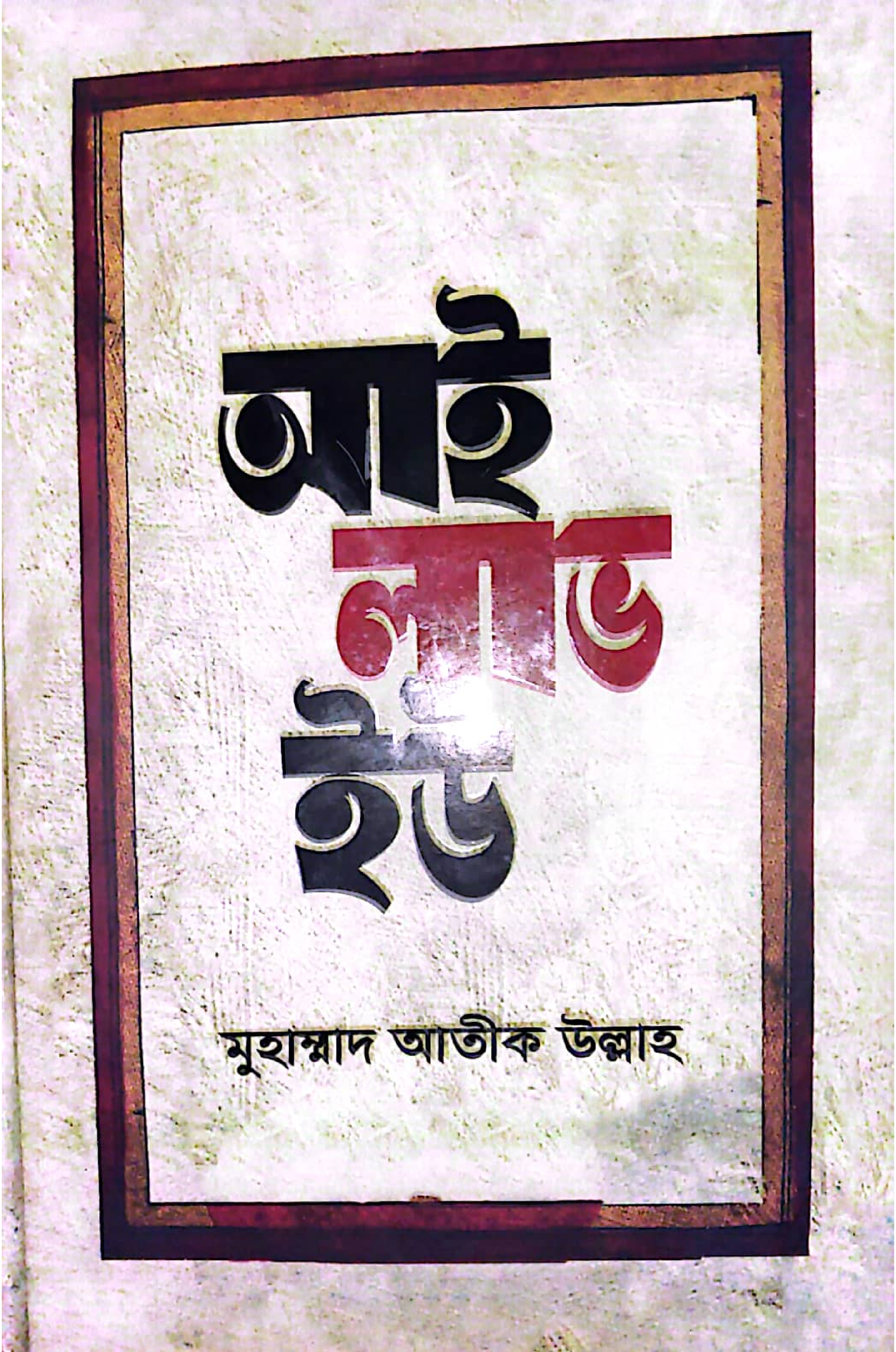

আই লাভ ইউ

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

আই লাভ ইউ

[জীবন জাগার গল্প-১৪]

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ
শিক্ষক
তারজামাতু মা'আনিল কুরআনিল কারীম
সীরাত, ইতিহাস
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম
শ্যামলী, ঢাকা

উৎসর্গ

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা
অসংখ্য ‘মাদরাসাতুল উম্মাহাত’-এর প্রতি।...

এসব মাদরাসায় অত্যন্ত স্বল্প সম্মানীর বিনিময়ে
খেদমত করে যাওয়া সম্মানিত শিক্ষিকাগণের প্রতি।...

এসব মাদরাসায় থাকা-খাওয়ার চরম কষ্ট স্বীকার করে
অধ্যয়নরত ভবিষ্যতের উম্মাহাতের প্রতি।...

রাব্বে কারীম সবার মেহনত কবুল করুন।
সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন।

শুরুর কথা

- হুজুর হয়ে বইয়ের নাম I Love You দিলেন।
- কেন? দিলে কী হয়েছে?
- ব্যাপারটা কেমন বেখাপ্পা ঠেকে না?
- আমার কাছে তো বেশ 'খাপ্পা'ই ঠেকছে!
- লোকজন কী ভাববে?
- আরে ভাই, লোকজন কী ভাবে, সেটা দিয়ে আমি কী করবো! আমার ভাবনার মানদণ্ড হবে 'দ্বীন ও শরীয়ত'। যে যার রুচি ও বোধের পাটাতন থেকে চিন্তা করে! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুসলমান ভাইকে ভালোলাগলে তাকে বলবে, আমি আপনাকে আল্লাহর জন্যে ভালোবাসি!' (ইন্নী উহিব্বুকা ফিল্লাহ)।

★★★

বাক্যটা শুনলেই কারো কারো চোখ বড় বড় হয়ে যায়! কেন? বাক্যটার পুরোই অবয়বই কি খারাপ? যে বাক্য আল্লাহর নবী ব্যবহার করেছেন। দুনিয়ার তাবৎ ভাল মানুষেরা ব্যবহার করেছেন ও করছেন ও করে যাবেন, সেটা খারাপ হয় কী করে? সমাজে বাক্যটার 'ব্যাড ইমেজ'-এর কারণে? এমন অনেক শব্দই তো আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি।

★★★

দুটি বিষয়। একটা হল আকীদা। আরেকটা আখলাক। আমাদের কথা বা লেখায় যদি আকীদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও কুফরের সঙ্গে সদৃশ রাখে এমন কোনো শব্দ বা বাক্য প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে সেটাকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলা আবশ্যক। আর যদি শব্দটা আখলাক সম্পর্কিত হয় এবং সেটা মুসলমান কাফের উভয়েই ব্যবহার করে তাহলে সেটা কাফেরের বহুল ব্যবহারের কারণে পরিত্যাজ্য হবে কেন? যদিও 'আই লাভ ইউ' বাক্যটার ব্যবহার বাহ্যিকভাবে নিন্দনীয় ক্ষেত্রেই বহুল চর্চিত; কিন্তু ধর্মীয় মহলেও কম চর্চিত নয়।

★★★

সফল সংসারের মূল চাবিকাঠি কে? স্বামী নাকি স্ত্রী? উত্তরটা এককথায় দেওয়া কঠিনই বটে! উত্তর খোঁজার আগে সংসারে মহীয়সীগণের ভূমিকা নিয়ে একটু ভাবনা-চিন্তা করা যাক! কোথায় যেন পড়েছিলাম,
-সংসারে পুরুষের চেয়ে একজন নারী অনেক বেশি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে! নারীকে যাই দেয়া হোক, সে তার বিনিময়ে দ্বিগুণ বা কয়েকগুণ বা আরও বেশি ফিরিয়ে

দেয়! নারীকে একফোঁটা পানি দিলে সে আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতে একটি শিশু উপহার দেয়। নারীকে একটি ছোট্ট গৃহকোণ দিলে সে একটি উষ্ণ সংসার উপহার দেয়। নারীকে একটি ছোট্ট মুচকি হাসি দিলে বিনিময়ে পুরো একটি হৃদয় দিয়ে দেয়। নারীকে সামান্য একব্যাগ বাজার দিলে সে বিনিময়ে কত কি সুস্বাদু খাবার উপহার দেয়। সামান্য কবুল বললে নিজেকে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে এনে উপহার দেয়। এজন্য তার দিকে ক্ষুদ্র একটি নুড়িও ছুড়ে মারার আগে খেয়াল রাখতে হবে, এর বিনিময়ে তার পক্ষ থেকে কী আসতে পারে।

* * *

মাঝেমধ্যে বড্ড বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়! সবাই ধরে নেয়, গল্পে বা লেখাগুলোর 'আমি' মানেই আমি। এমন চিন্তা লেখকের জন্যে বেশ বিপজ্জনক। কেউ কেউ আরেকটু আগ বেড়ে লেখায় আলোচিত ব্যক্তির তত্ত্ব-তালাশ সুলুকসন্ধানে নেমে পড়ে! রীতিমতো মাদরাসায় এসে হাজির হয়! আরে, তার পরিচয় যদি বলার ইচ্ছা থাকত, সেটা বইয়েই বলে দিতাম! থাক না কিছু কথা গোপন হয়ে! থাক না কিছু স্মৃতি আপন হয়ে!

* * *

এসব গল্প কেন লেখা হচ্ছে? সাহিত্যচর্চার জন্যে? উঁহু, না। সাহিত্য অনেক বড় জিনিস। একটা লেখা সাহিত্যের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হলে, তার মধ্যে অনেক প্রসাদগুণ থাকতে হয়! ভাষার চারু-কারু থাকতে হয়! ভাব-রসের গভীরতা থাকতে হয়! আমাদের লেখাগুলোতে এসবের কিছুই নেই। কারণ লেখাগুলো সাহিত্যচর্চার জন্যে রচিত হয়নি। কিছু লিখলেই সাহিত্য হয়ে যায় না। লেখক মানেই সাহিত্যিক নন। সবার জীবনেই কিছু না কিছু গল্প থাকে! তারা সেটা বলার চেষ্টা করেন। আমাদেরও কিছু গল্প আছে, আমরা সেগুলো বলার চেষ্টা করছি! সব গল্পবলিয়ে কিন্তু গল্প বলায় দক্ষ নন। বলার ক্ষেত্রে যেমন দক্ষ-অদক্ষ আছে, লেখার ক্ষেত্রেও তেমনি দক্ষ-অদক্ষ আছে। আমরা অদক্ষ। এটা স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই। অভিজ্ঞরা ব্যাপারটা ঠিক ঠিক ধরতে পারেন!

* * *

এজন্য আমরা গল্প বলার সময় নির্ভার থাকতে পারি। আপন মনে গল্পটা গড়গড় করে বলে যাই। ভাষা কেমন হবে, শব্দ কেমন হবে, বানান কী হবে, ব্যাকরণ কী হবে, এসব নিয়ে ভাবিত হই না। এসব নিয়ে ভাবাভাবির কাজ সাহিত্যিকদের। পেশাদার লেখকদের। যোগ্য ব্যক্তিদের! তাই আমরা আনাড়ি হাতে কোনোরকমে আঁচড় কেটেই খালাস!

রাব্বে কারীম বইয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

সূচিপত্র

আদর্শ সতীন	১১
থ্রি-জি হিট	১৫
সোনালি প্রজাপতি	১৮
হুরবিবি	২২
I Love you	২৬
আ-শিরু বিল মা'রূফ	৪৭
স্ত্রীর বিকল্প	৫১
যাহ, দুষ্ট!	৫৩
চড়ুইদম্পতি	৫৭
দ্বিতীয় বাসর	৭১
ভালোবাসামাখা তরকারি	৯১
তামীমা	১১৪
তালাক	১২৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আদর্শ সতীন

বাগদাদের ব্যস্ত বাজার। নতুন দোকান খোলার মতো একচিলতে জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব! তারপরও নানা কায়দা-কসরত করে, কাপড়পট্টিতে দোকান খুলে বসেছে এক ব্যবসায়ী। মধ্যতিরিশের। অল্প কদিনের পসার বেশ ভালোই জমিয়ে ফেলল হাস্যরসিক মানুষটা। ক্রেতারা তার দোকানে এলে পণ্যের পাশাপাশি বাড়তি 'বাক্যরস'ও উপভোগ করতে পারে। কাব্যরসও থাকে সাথে। পুরো বাগদাদই সাহিত্য-জ্বরে আক্রান্ত। ঘরে ঘরে কবি। কবিদের কেউ কেউ নিজের কাব্যপ্রতিভা নারীপ্রেম বা রাজপ্রেমের পেছনে ব্যয় করলেও ইনি নিজের সবটুকু প্রতিভা ঢেলে দিচ্ছেন ক্রেতার মনোরঞ্জনে। প্রত্যেক ক্রেতাকে উদ্দেশ্য করেই এক বা দু' লাইনের কবিতা আওড়াচ্ছেন। দোকানে একবার কেউ এলেই হল, কিছু না কিনে খালি হাতে ফিরে যাওয়ার জো নেই। দোকানির বাক্যবাণ এতই মোহজাল বিস্তার করে যে, গতকাল যে লোকটি একগাদা কাপড় কিনে নিয়ে গেছে সেও ভাবে, আজও এ লোকের দোকান থেকে একটা কিছু কেনা উচিত! বাকপণ্ডিত হলেও দামে ঠকায় না। ভেজাল পণ্য রাখে না। তুলনামূলক কম দামে সেরা জিনিসটা দেওয়ার চেষ্টা করে।

***

একদিন পড়ন্ত দুপুরে একজন ক্রেতা এল। বোরখাবৃতা। দোকানে তখন কোনো কর্মচারী নেই। মহিলা এটাসেটা দেখতে শুরু করল। একগাদা কাপড় কিনল। কেনা শেষ হওয়ার পরও মহিলার উঠে যাওয়ার নাম-গন্ধ নেই। বোধহয় কিছু একটা বলতে চায়। আচমকা বাতাসের ঝাপটায় মহিলার মুখের নেকাব সরে গেল। দোকানদার একঝলক দেখেই বিমোহিত! স্নিগ্ধ রূপের মনোহর মুখচ্ছবি! দোকানির মুখ দিয়ে অজান্তেই বিমুগ্ধবচন বেরিয়ে এল।

–আল্লাহ, এ কী দেখলাম আমি! এ যে হুরপরি!

এবার মেয়েটা বলে উঠল,

–আমি আসলে কাপড় কিনতে আসিনি, আমি কয়েকদিন ধরে বাজারে ঘোরাঘুরি করছি তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য। সরাসরিই বলছি, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?

–আমার আগের সংসার আছে। স্ত্রী আমার চাচাত বোন। সে আমার কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছে, আমি যেন তার বর্তমানে আর কাউকে বিয়ে না করি! ঘরে একটা ছেলেও আছে। সুন্দর সুখের সংসার আমাদের। আরেকটা বিয়ে করে শুধু শুধু দায়িত্ব বাড়াতে যাব কেন?

–তুমি রাজি কি না সেটা বলো। আমার টাকা পয়সা আছে। আমার ভরণ-পোষণ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার কাছে প্রতিদিন থাকতেও হবে না। সপ্তাহে শুধু দুদিন থাকলেই চলবে। আমি যেচে এসে তোমার কাছে বিয়ে বসতে চাচ্ছি বলে আমাকে বেহায়া ভেবে বসো না। এটা ঠিক, আমি ছোটবেলা থেকে কিছুটা ঠোঁটকাটা স্বভাবের! এতদিন বাবার সঙ্গে ছিলাম। তিনি মারা গেছেন। আমার জন্যে রেখে গেছেন অঢেল টাকা পয়সা। অফুরন্ত ধন-সম্পদ। অনেকেই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। তাদের কাউকে আমার পছন্দ হয়নি।

-তাই বলে একজন দোজবরকে পছন্দ করবে?

-আমি সংসার বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ মানুষ খুঁজছিলাম। যে হবে সুদর্শন, রসিক আবার সম্পদশালী! সম্পদের প্রতি লোভী হবে না।. যে আমাকে আগ থেকে চিনবে না। অনেক খুঁজেছি, তোমার মতো আর কাউকে পাইনি। কী আর করা, দোজবরকেই না হয় বিয়ে করব।

***

বিয়ে হয়ে গেল। নতুন স্ত্রীকে তার ঘরে পৌঁছে দিল। দোকানি একরাত তার কাছে থেকেও গেল। পরদিন বাড়িতে ফিরে আগের স্ত্রীকে বলল,

–একদল বন্ধুর ধরাধরিতে তাদের সঙ্গে রাতটা থেকে যেতে হয়েছে। বিশেষ কাজ ছিল।

***

সতর্কতা সত্ত্বেও প্রথম স্ত্রীর মনে সন্দেহ দানা বাঁধল। মুখ ফুটে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে খোঁজ-খবর শুরু করল। একদিন ঘরের

পরিচারিকাকে গোপনে স্বামীর পিছু পিছু পাঠাল। সব খবর পাওয়া গেল। স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। স্ত্রী ব্যাপারটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করল না। চুপচাপ মেনে নিল। পরিচারিকাকেও মুখ না খুলতে বলে দিল।

***

একবছরের মাথায় স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ল। কেনযেন কোনো ওষুধেই কাজ হচ্ছিল না। বেশ কিছুদিন রোগে ভুগে হঠাৎ করে লোকটা মারা গেল। প্রথম স্ত্রী স্বামীর সমুদয় ধন-সম্পদ জড়ো করে দেখলেন, সর্বমোট আট হাজার দিনার আছে। কুরআনে বর্ণিত মিরাসের সূত্রমতে ছেলের জন্যে রাখলেন সাত হাজার। বাকি রইল একহাজার। দু-ভাগ করলেন। একভাগ নিজে রেখে বাকি পাঁচশ দিনার পরিচারিকাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন,

–তাকে স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ জানাবে। পুরো সম্পত্তির হিশেবটাও দেবে। শরীয়তমতে ছেলে থাকলে স্ত্রী পাবে সম্পদের এক অষ্টমাংশ। সেটা আমরা দুজনে অর্ধাঅর্ধি ভাগ করে নিয়েছি।

***

খাদেমা গিয়ে দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে দ্বিতীয়া অবাক। চিনতে পারেনি। পরিচারিকা পরিচয় দিল। ভেতরে বসে বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানাল। দ্বিতীয়া স্বামীর মৃত্যুতে ভীষণ শোকাহত হল। কিছুক্ষণ পর কান্না থামিয়ে বাক্স থেকে একটা কাগজ বের করল। পরিচারিকাকে সেটা দিয়ে বলল, 'তোমার মনিবকে আমার সালাম দেবে। আর শোনো, তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এই কাগজে তার স্বীকৃতি আছে। তোমার নিয়ে আসা পাঁচশ দিনারও নিয়ে যাও! এখন আর এই সম্পদে আমার কোনো অধিকার নেই।'

***

পুরুষ লোকটি ওয়াদা রক্ষা করতে পারেনি; এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দু-নারীই মহত্তের পরিচয় দিয়েছে—

☞ (এক) প্রথমজন স্বামীর আচরণে ব্যথা পেলেও, মুখ ফুটে কখনো কিছু বলেনি। আত্মমর্যাদাবোধ থাকলেও সতীনের প্রতি কর্তব্যে ভুল করেনি। হিংসা-ঈর্ষার ফাঁদে পড়ে বিবেকহারা হয়নি। নিজের দ্বীনদারী, নিজের

তাকওয়া খুইয়ে বসেনি। মেয়েসুলভ মানসিকতা তাকে তাকওয়া থেকেও বিচ্যুত করতে পারেনি। স্বামী মারা গেলেও কর্তব্যকর্মে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। ইনসাফ আর বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছে। একজন মহীয়সী নারী।

☞ (দুই) দ্বিতীয়াকে স্বামী তালাক দেয়নি; কিন্তু বিয়ের আগে স্বামীকে বলেছিল, তার টাকার প্রয়োজন নেই। এখন স্বামীর মৃত্যুর পর, সতীনকে টাকা না নেয়ার কথা সরাসরি বললে, তার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগতে পারে। সত্যটাকে একটু ঘুরিয়ে বলেছে, স্বামীর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আসলেই তো, স্বামী মারা গেলে, দুনিয়াতে একপ্রকার ছাড়াছাড়িই হয়ে যায়। দেখা হবে তো সেই জান্নাতে।

☞ (তিন) দ্বিতীয়া চিন্তা করেছেন, আমার কাছে তো চলার মতো পয়সা-কড়ি আছে, শুধু শুধু কেন স্বামীর টাকা নিতে যাব? আমার চেয়ে তাদেরই বেশি দরকার। স্বামী মারা যাওয়ার পর দোকান বন্ধ হয়ে যাবে, অভাব-অনটন দেখা দেবে; কিন্তু সরাসরি বললে, প্রথমা গ্রহণ নাও করতে পারে। তাই ঘুরিয়ে ছাড়াছাড়ির কথা বলতে হল। পাশাপাশি প্রথমার প্রতি শ্রদ্ধাবোধও কাজ করেছে। যে মহিলা এভাবে অচেনা-অদেখা সতীনের প্রাপ্য পাঠাতে পারে, সে সাধারণ কেউ হতেই পারে না।

থ্রি-জি হিট

থ্রি-ডাইমেনশন। ত্রিমাত্রিক ব্যাপারগুলো বিজ্ঞানের এলাকা; কিন্তু বিজ্ঞানের 'দুর্বোধ্য' গণ্ডি পেরিয়ে 'ত্রি-মাত্রা কখনো কখনো জীবনের গণ্ডিতেও ঢুকে পড়ে। জীবনে আসে ছন্দপতন।

***

বিয়ের পর থেকেই স্ত্রী 'ব্যতিক্রমী' আচরণ করে আসছে। স্বামী ডানে যেতে বললে স্ত্রী যায় বামে। স্বামী যদি বলে এখন রাত, স্ত্রী সোজা বলে দেয়, অসম্ভব! এখন ফকফকা দিন। এভাবেই চলছে। স্বামী বেচারা অনেক সয়েছে। আর সহ্য করতে পারছে না। নানাজনের সঙ্গে পরামর্শ করল। মুরুব্বিরা বলে ধৈর্য্য ধরতে। সমবয়সীরা বলে, আরেকটা বিয়ে করে ফেলো।

***

ভীষণ সংকটের মধ্যে পড়া গেল। কোনো সুরাহা হচ্ছে না। উল্টো বউয়ের অত্যাচার দিনদিন বেড়েই যাচ্ছে। সারাদিন কাজ করে ঘরে এসে দেখে, বউ নেই। পাড়া বেড়াতে গেছে। আরেক দিন দেখে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। চুলায় হাঁড়ি চড়েনি। রাতে চড়বে কি-না, সেটাও বলা যাচ্ছে না। কী করা যায়? শেষে অতিষ্ঠ হয়ে বন্ধু-বান্ধবের দেদার উৎসাহে নতুনের 'দীদার' লাভের দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিল। সংগোপনে কাজে অগ্রগতি হতে শুরু করল। পাত্রী দেখার পালা শেষ; কিন্তু বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো, কিভাবে যেন খবরটা বউয়ের কান পর্যন্ত পৌছে গেল। তবে রে, স্বামীর দিকে তেড়েফুঁড়ে এল। প্রথমে রাগারাগি করল! কাজ হল না। স্বামীর চোখে তখন নতুনের নেশা লেগেছে। কিছুটা সাহসও হয়তো বেড়েছে।

স্বামীকে বশ করা গেল না। বিয়ে করবেই। আচ্ছা, ঠিক আছে। উপায় আরও আছে। বউ এবার পাত্রীর কাছে ধন্না দিল। অনেক বোঝাল; কিন্তু

এ-বেটিও দোজবরের ঘর করার জন্যে রীতিমতো দিওয়ানি হয়ে আছে! কিছুতেই বিয়ে থেকে ফেরানো গেল না।

জাঁদরেল বউ তবুও দমে গেল না। একদিন সময় করে হবু পাত্রীর মায়ের কাছে গেল। এভাবে-সেভাবে অনেক করে বোঝাল। এখানে বিয়ে হলে, তার মেয়ে কিছুতেই সুখে থাকতে পারবে না। মেনিমুখোটা নতুন শাশুড়িকেও কিভাবে যেন ছু-মন্তর করে বশ করে গেছে। এ-লোকের কাছে নিজের মেয়ের দেবেই দেবে। হোক না দ্বিতীয় বিয়ে, সমস্যা নেই।

***

সবার কাছে যাওয়া হয়েছে। কেউ বিয়ে বন্ধ করতে রাজি নয়। বাকি রইল আরেকজন। মেয়ের বাবা। এদিকে স্বামী বিয়ের তোড়জোড় চালাতে লাগল পুরোদমে। তার সঙ্গে চূড়ান্ত একটা বিহিত করতেই হবে।

-তুমি এই বিয়ে থেকে সরে এসো। আমি ভালো হয়ে যাব। যেভাবে বলবে সেভাবে চলব। কথা দিলাম।

-তোমার কথার বিশ্বাস কী? আর তুমি যেভাবে সবার কাছে ধন্না দিয়ে বেড়াচ্ছ, বিয়েটা না করলে আমি বন্ধু-বান্ধবের কাছে চোখ দেখাতে পারব না।

-তুমি সুখী হতে পারবে না। দু-বউ নিয়ে ঘর করার মানুষ তুমি নও। তুমি এক বউকে সামলে রাখতে পারোনি, দুজনকে কিভাবে সামলাবে?

-সেটা আমি বুঝব। তোমাকে এ-নিয়ে ভাবতে হবে না। সবাই কি তোমার মতো দজ্জাল নাকি?

-এই মুখ খারাপ করবে না কিন্তু!

-করলে কী করবে?

-বেশ সাহস হয়েছে দেখি! বেশি সাহস কিন্তু ভাল নয়।

-আমার ভালো-মন্দ আমি বুঝব। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও। অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। ঘর করতে চাইলে চুপচাপ দেখে যাও।

-আমার ঘর আরেকজন দখল করে নেবে— এটা আমি সহ্য করি কী করে? আমি বেঁচে থাকতে এটা হতেই পারে না।

-বিয়ে আমি করবই। অনেক খুঁজে একটা ভালো মেয়ে পেয়েছি। হাতছাড়া করতে চাই না।

-তাহলে তুমি কিছুতেই এ-বিয়ে থেকে ফিরবে না?।

-কস্মিনকালেও না। তুমি সতীনের সঙ্গে স্বামীর ঘর করতে না চাইলে, আমার কিছু করার নেই।

-তার মানে তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?

-সেটা তোমার ব্যাপার।

-ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। আজ রাতটা আরেকটু ভেবে দেখো। আমি কাল বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

-অপেক্ষা করে লাভ নেই। যা বলেছি, তার একচুলও নড়চড় হবে না।

-তুমি আমার কথাটা মেনে নিলেই ভাল করতে। তবুও তোমার ইচ্ছা।

***

ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বিয়ের প্রস্তুতি এবার আরও জোরেশোরে শুরু হলো। বর্ষা এসে যাওয়ায় তারিখ একটু পেছাতে হলো। কিন্তু জামাই হওয়ার আগেই জামাই আদর শুরু হয়ে গেল। বিয়ে না করেই শ্বশুরবাড়িতে জম্পেশ খাওয়া-দাওয়া চলছে। আস্তে আস্তে বিয়ের দিন এসে গেল। কাজী সাহেব এসেছেন। বিয়ে পড়ানো শুরু হলো। কাগজে মেয়ের বাবার সই লাগবে। খোঁজাখুঁজি শুরু হতেই একজন হন্ত-দন্ত হয়ে দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,

-সব্বোনাশ হয়ে গেছে! সব্বোনাশ হয়ে গেছে!

-কী হয়েছে? কী হয়েছে?

-মেয়ের বাবা আরেক বিয়ে করে ফেলেছে?

-ও মাগো, কাকে বিয়ে করেছে?

-নতুন জামাইয়ের পুরনো বউকে!

সাথে সাথে এ-বিয়েবাড়িতে দুপদুপ করে তিনজন বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল।

সোনালি প্রজাপতি

আরিশ। মিসরের সিনাইয়ের একটা স্থানের নাম। ঘটনাটা এখানেরই। যাবদা মানুষটা খুবই ভাল। স্বামীর সেবাই তার ধ্যান-জ্ঞান-জপ। আল্লাহ তাআলা একটি সন্তান দান করেছেন। তাকে নিয়ে দিনের বড় একটা অংশ কেটে যায়। ঘরে বৃদ্ধা শাশুড়ি। তার সেবা-যত্নেও কোনো ত্রুটি করে না। যখন যা দরকার এগিয়ে-বাড়িয়ে দেয়। হাতে-পায়ে ধরে ধরে নিয়ে সব কাজ করায়। নিজের মায়ের মতোই শাশুড়িকে দেখে। স্বামীও খুব ভাল ছিল। কিন্তু গত কিছুদিন যাবত তার আচরণে ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে।

***

বউয়ের বড় ভাই বিদেশে থাকেন। বিয়ের সময় থাকতে পারেননি। ছোটবোনের স্বামীর প্রতি তার গভীর টান। একমাত্র আদরের ছোটবোনের জামাই। তাকে মাথায় তুলে রাখতে চান। বিভিন্ন সময় নানাজনের মারফতে চালানি পাঠান। কখনো সুন্দর রেজার। কখনো দামি লাইটার। কখনো বহুমূল্য ঘড়ি। এবার পাঠালেন লেটেস্ট মডেলের এন্ড্রয়েড মোবাইল। এটা না হলে চলছে না। জামাইয়ের আগের মোবাইলটা যাচ্ছেতাই। কোনোরকমে কথা বলা যায়। এবার ইমো-ওয়াটসআপ-ভাইবার সবই ব্যবহার করা যাবে।

জামাই আগে কখনো ইন্টারনেট চালায়নি। ফেসবুক-টুইটার-ইনস্টাগ্রাম-টেলিগ্রাম কী কাকে বলে, বলতেই পারত না। বিদেশ থেকে ভাইয়া মোবাইল পাঠানোর সময় বোন ও বোনজামাই উভয়ের জন্যই মোবাইল পাঠিয়েছেন। সাথে সাথে দুজনের নামে একটা করে ফেসবুক একাউন্ট খুলে দিয়েছেন। ভাইবার-ইমোতেও। ব্যস, এবার প্রতিদিন কথা চলছে। কখনো ইমোতে, কখনো ম্যাসেনজারে।

***

অবস্থার পরিবর্তন হতে দেরি হল না। যাবদার ভালো মানুষ স্বামী চাকরি করত শায়খ যুয়াইয়িদের একটা অফিসে। শায়খ যুয়াইয়িদও সিনাইয়ের একটা শহর। আগে অফিস শেষ হলেই স্বামী দ্রুত ঘরে ফিরত। কোথাও যেত না। কিন্তু এখন রাত গভীর হলেও তার দেখা নেই। ছুটির

দিনগুলোতে আগে বাড়ি ছেড়ে নড়ত না। এখন ছুটির আগের রাত পরের রাতও বাড়ির বাইরে থাকে। বাড়িতে এলেও সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কার সঙ্গে যেন চ্যাট করে। গভীর আগ্রহে। নেশালুর মতো। খেতে বসেও তার একটা চোখ মোবাইলে থাকে।

***

পরিবর্তনটা এত দ্রুত ঘটছে, যাবদা তার স্বামীর আচরণের খেই ধরতেই পারছে না। তার সঙ্গেও কথাবার্তা বলে না। সারাক্ষণ পালাই পালাই ভাব। দিনদিন সমস্যাটা বাড়তে লাগল। এ সংসারের প্রতি স্বামী পুরোপুরি উদাসীন হয়ে গেছে। বাজার-সদাইয়ের প্রতিও অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। রাতেও আলাদা থাকতে শুরু করেছে। আগে পাঁচওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে পড়ত। নামাজ বাদ দিয়েছে বেশ আগে। এবার দাঁড়িও ছোট করতে শুরু করেছে। যাবদা আর থাকতে না পেরে সৌদিতে অবস্থানরত বড় ভাইকে বিষয়টা খুলে বলল। তিনি আশ্বাস দিলেন, ব্যাপারটা দেখবেন। ফোন করলেন। অবাক করা ব্যাপার, তার ফোন রিসিভ করল না বোনজামাই।

***

খোঁজ নেয়া শুরু করলেন। খোঁজাখুঁজির পর বের হলো, জামাইয়ের ফ্রেন্ডলিস্টে একটা আইডি আছে। নাম (الفراشة الذهبية) সোনালি প্রজাপতি। তার সাথেই উড়ে বেড়াচ্ছে সারাক্ষণ। মধুও খাচ্ছে বোধ হয় ডুবে ডুবে। বোনকে বললেন,

-ও যখন ঘুমিয়ে থাকে বা মোবাইল রেখে কোথাও যায়, প্রজাপতির সঙ্গে কী কথা বলে সেটা খোঁজ নিয়ে দেখবি। ইনবক্সে কী ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, সেটা জানা দরকার।

-তিনি তো এক মুহূর্তের জন্যেও মোবাইল হাতছাড়া করেন না। বাথরুমে যাওয়ার সময়ও নিয়ে যান। সেখানে বসে বসেও দীর্ঘ সময় কী সব করেন।

-কোনো সুযোগ নেই?

-আছে মনে হয়। গোসলের সময় মাঝেমধ্যে রেখে যান।

-ঠিক আছে! পাসওয়ার্ড আমার জানা আছে। কারণ সব তো আমিই খুলে দিয়েছি। এখন বদলে না ফেললেই হয়! ফেসবুকেরটা বদলে ফেলেছে। না হলে আমি এখান থেকেই ঢুকতে পারতাম। মোবাইলেরটা বদলানোর কথা নয়।

* * *

যাবদা সুযোগমতো দেখল। সে ভীষণ অবাক! নিজের নাম দিয়েছে (ولد العز) সম্মানের বরপুত্র। বাহ! বেশ ডাকাবুকো নাম বাগিয়েছে তো! গোটা ইনবক্স মিষ্টি মিষ্টি কথায় টইটম্বুর হয়ে আছে। আরবের বিখ্যাত কবিদের লাইনগুলো নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছে। বলেছে, কবিতাটা আজ রাতেই লেখা। ও-পক্ষ রীতিমতো মজে গলে চুইয়ে চুইয়ে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা! ভাবখানা এমন, খোদ ইমরাউল কায়েস তার আশনাইতে হাবুডুবু-ডুবুহাবু খাচ্ছে। আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা।

* * *

ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করল। একটা ছদ্ম আইডি খোলার ব্যবস্থা হলো। বড়ভাই সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলেন। নতুন আইডির নাম দেয়া হলো (أبو القعقاع)। কা'কা' অর্থ, অস্ত্রের ঝনঝনানি। দাঁতে কপাটি লাগা কালজ্বর। পোস্ট দেয়া শুরু করল। যুদ্ধ-হত্যা-গলাকেটে জবাই আর জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা বিষয়ে। কয়েকদিন পর আবুল ইযযকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট সেন্ড করল। সাথে সাথে একসেপ্ট। ইনবক্সে টুকটাক কথাবার্তা শুরু হলো। এভাবে কিছুদিন গেল। একদিন জামাইবাবু বেশ উষ্মার সাথেই প্রশ্ন করল,

-কা'কা' ভাই!

-এ্যাই, আমি কা'কা' নই, কা'কার বাপ!

-ও আচ্ছা, ভুল হয়ে গেছে। আপনি সবসময় এমন গরম গরম বিষয়ে পোস্ট দেন কেন?

-বর্তমানে এসব না হলে চলে না। দুষ্টলোকে ছেয়ে গেছে সমাজ-দেশ-বিশ্ব। সোজা করতে হলে ডাণ্ডার কোঁৎকা না হাঁকালে ঠিক হবে না। আর আমি একটা মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছি।

-কী মিশন?

-আপনাকে বলি চুপিচুপি। কাউকে আবার বলে দেবেন না। আমি 'ইয়ে'-এর সিনাই শাখার প্রধান। আমার প্রধান কাজ হচ্ছে, সিনাইয়ে গোপনে লুকিয়ে থাকা মোসাদ এজেন্টদের ট্রেস করা। তাদেরকে ধরে ধরে জবাই করা। আগুনে পুড়িয়ে মারা। গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়া।

-এমন কাউকে পেয়েছেন?

-অনেক কষ্টে একজনকে পেয়েছি। তার ফেসবুক আইডিও শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

-তাই নাকি, কী নামে আইডি?

-বলা কি ঠিক হবে?

-একটু বলুন না, আমি কাউকে বলবো না। প্রমিস!

-আইডির নাম 'সোনালি প্রজাপতি'।

-কীহ! ক্বি ক্বি নাম বললেন?

-আল ফারাশাতুয-যাহাবিয়্যাহ! এই বেটির কাজ হলো মিসর থেকে, বিশেষ করে সিনাই থেকে মিসরীয় এজেন্ট সংগ্রহ করা। তাদেরকে দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি চালানো। আমরা গোপনসূত্রে জানতে পেরেছি, এই প্রজাপতি ইদানীং কার সঙ্গে যেন বেশি সময় কাটাচ্ছে। অনলাইনে তো বটেই অফলাইনেও। লোকটা মিসরি এবং যদ্দূর জানতে পেরেছি বিবাহিত। এসব জানতে পেরেছি, তেলআবিবে পাঠানো প্রজাপতির একটা সাংকেতিক-কোডেড মেসেজ ডিকোড করার পর।

-এ এ একটু সা-- সামান্য অপেক্ষা করুন! আমি পানি খেয়ে আসি!

***

-জি, বলুন।

-আপনি দেখেছেন, গত কিছুদিন যাবত সিনাইতে ইসরায়েলি বিমান হামলা বেড়ে গেছে। আমাদের ধারণা, প্রজাপতির সেই প্রেমিকপ্রবরই এসবের মূল হোতা। তার বেয়ারিং ধরেই ইহুদির বাচ্চারা সিনাইয়ের নিরপরাধ মানুষগুলোকে মারছে। আশা করছি, কিছুদিনের মধ্যেই সেই গাদ্দারকে ধরে ফেলতে পারব। একজন মুসলমান হয়ে, ইহুদি মেয়ের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে টিকটিকিগিরি করছে। আমরা তাকে জর্দানি পাইলট মুয়াজের মতো জীবন্ত আগুনে পোড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি!

-আ আ আমার ঘুম পাচ্ছে! আজকের মতো এখানেই শেষ করি।

-আচ্ছা ঠিক আছে।

***

যাবদা ঘুমিয়ে আছে। দরজায় টোকার আওয়াজে ঘুম ভাঙল।

-যাবদা! যাবদা!

-কী?

-আমার টুপিটা কোথায়? জায়নামাটাও পাচ্ছি না।

হুরবিবি

সীমান্তে শত্রুদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। খলিফার কাছে বারবার অভিযোগ আসছে। নিরীহ প্রজারা খুবই কষ্টে আছে। আর বসে থাকা যায় না। জিহাদের ডাক দেয়া হল। বসরা শহর জেগে উঠল জিহাদি চেতনায়। এখানে থাকেন আবদুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ রহ.। অসাধারণ বাগ্মী। খুতবা দিতে দাঁড়ালে মুখ দিয়ে কথা নয়; যেন আগুন ঝরে। অগ্নিবর্ষী ভাষায় বসরাবাসীকে জাগিয়ে তোলেন। শহীদ হলে জান্নাতে কি কি পাওয়া যাবে, সবিস্তারে বললেন। সুন্দরী ডাগরচোখা পটলচেরা হুরদের কথা বললেন। তাদের সঙ্গে কিভাবে শহীদের বিয়ে হবে, তার সালংকার বর্ণনা দিলেন। এমন বক্তব্য শুনে ঘরে বসে থাকা যায় না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে যোগ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল।

***

খতীব সাহেবের বয়ান এক বৃদ্ধ মায়ের কানেও গেল। উম্মে ইবরাহীম নামেই পড়শিরা তাকে চেনে। তার সোনার টুকরা ছেলে। নিজে যেতে না পারলেও কলিজার টুকরাকে পাঠানো যায় কি না, মা খতীব সাহেবের কাছে জানতে এসেছেন।

-ইয়া আবা উবাইদ!

-লাব্বাইক ইয়া উম্মাহ!

-তুমি কি আমার ছেলে ইবরাহীমকে চেনো? তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। পাত্রী দেখাশোনা শুরু হয়েছে। বসরার রঈস আদমিরা তাদের মেয়ের জন্যে প্রস্তাব পাঠাচ্ছে। কিন্তু তোমার কথায় বুঝলাম, আরও সুন্দর পাত্রীও পাওয়া যাওয়া সম্ভব। তুমি আরেকবার পাত্রীর রূপ-যৌবনের কথাগুলো বলো দেখি!

-ইয়া উম্মাহ! আল্লাহ তাআলা একজন শহীদের সঙ্গে বাহাত্তর জন হুরের বিয়ে দেবেন।

-বলো কি, এত এত পুত্রবধু হবে আমার?

-আরও বেশিও হতে পারে!

-তারা কেমন হবে?

-চোখগুলো হবে ডাগর ডাগর! তাদের নিঃশ্বাসে থাকবে অপূর্ব আতরের সুবাস। মিহি পোশাকের আড়ালের সবকিছু দেখা যাবে। তাদের চেহারার ঔজ্জ্বল্য চাঁদ-সুরুজকেও হার মানাবে। দেখে মনে হবে, একেকজন একেকটি সুরক্ষিত মণিমুক্তা। তাদের আরও বহু গুণ থাকবে। বলে শেষ করা যাবে না। আপনি পুত্রবধূ হিসেবে এমন হুরকে চোখ বুজে চয়ন করতে পারেন।

-আবা ওবায়েদ, আল্লাহর কসম! তোমার কথা শোনার পর, দুনিয়ার আর কোনো মেয়েকে পুত্রবধূ হিশেবে পছন্দ করতে পারব না। এত সুন্দর বৌমা আমি হাতছাড়া করতে চাই না। ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই আমি এমন রাঙা টুকটুকে রূপসী বৌমার স্বপ্ন দেখে আসছি। তুমি সাক্ষী থেকো, আমি এমন বৌমার জন্যে প্রস্তাব দিয়ে রাখছি। তুমি বিয়ের ব্যবস্থা কর।

-আমি কীভাবে ব্যবস্থা করব?

-কেন, সঙ্গে করে ময়দানে নিয়ে যাবে। এই যে, দেনমোহর (রাহাখরচা) বাবদ দশ হাজার দীনার। আশা করছি, আল্লাহ তাকে শাহাদাত নসীব করবেন। তাহলে ইবরাহীমের সুপারিশে আমার আর ওর আব্বুর জান্নাতে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হবে!

-ইয়া উম্মাহ, আপনি দেখছি, এক ঢিলে বহু পাখি শিকার করতে উদ্যোগী হয়েছেন! বুদ্ধিটাও মাশাআল্লাহ বেশ ভালোই ধরেছেন।

***

ইবরাহীমও বক্তব্য শুনতে এসেছিল। মা খতীব সাহেবের সঙ্গে কথা শেষ করেই ছেলের দিকে ফিরলেন।

-বাবা ইবরাহীম!

-লাব্বাইক, ইয়া আম্মাহ!

-আমি যে তোমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি! সব তো শুনলে, পাত্রী পছন্দ হয়েছে? এমন হীরের টুকরা বউ আর পাবে না! শুধু রাজকন্যাই নয়, সঙ্গে (যৌ...! হিসেবে) রাজত্বও পাবে! আরও পাবে বাবা-মাকে বাঁচানোর সুযোগ।

-ইয়া আম্মাহ, আমি রাজি!

-ইয়া আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন। আমার বেটাকে আমি এই হুরের সঙ্গে

বিয়ে দিয়েছি। আপনি বাসরের ব্যবস্থা করুন। আমার সারা জীবনের সঞ্চয়ও মোহরানাস্বরূপ দিয়ে দিয়েছি। ইয়া রাব, আপনি কবুল করে নিন।
-আমীন!
-ইবরাহীম!
-জি আম্মু!
-এই নাও আমার বৌমার মোহরানা। এটা দিয়ে বরযাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলো। ভালো দেখে ঘোড়া-তরবারি কিনে আনো।

***

উম্মে ইবরাহীম ঘরে ফিরে গেলেন। ছেলেকে শেষ বিদায় দেয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। সাজিয়ে দিতে হবে বিয়ের সাজে। ঘোড়ায় জিনপোষ পরাতে হবে। নওশার নাগরা-আচকান হাতের কাছে এনে রাখতে হবে। বাড়ির পথে হাঁটছেন আর বিড়বিড় করে পড়ছেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জানমাল কিনে নিয়েছেন। (সূরা তাওবা : ১১১)

***

সব প্রস্তুত। এখন কাফেলা রওয়ানা হবে। বুড়িমা ছেলের হাত ধরে বসে আছেন। মুখে-চোখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বারবার বলছেন,
-চিন্তা করো না, খুব শিগগিরই দেখা হবে।
ইবরাহীম ঘোড়ার উপর চড়ে বসল। মা লাগাম ধরে ছেলেকে রাজফোটক পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। যাবার বেলায় ছেলের হাতে একটা পুঁটলি তুলে দিয়ে বললেন,
-এটা রাখো, তোমার কাছে।
-এতে কী আছে?
-তোমার বিয়ের পোশাক! শাদা কাফন আর হানুত (একপ্রকার সুগন্ধি)। ময়দানে যাওয়ার সময় কাফন পরে বের হবে। গায়ে হানুতও মেখে নেবে। শোনো, তোমাকে আমি আল্লাহর রাস্তায় ভীরু হিসেবে দেখতে চাই না। কাছে এসো, শেষবারের মত তোমাকে চুমু খাই। আর হ্যাঁ, চাই না কেয়ামতের ময়দানের আগে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হোক।

***

শায়খ আবদুল ওয়াহেদ বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন। মূল ফৌজের সঙ্গে যোগ দিলেন। যুদ্ধ শুরু হলো। ইবরাহীম ছিলেন সবার অগ্রভাগে। কাফের বাহিনীকে কচুকাটা করতে করতে তাদের ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেলেন। একপর্যায়ে কাফেরদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। আর বের হতে পারলেন না।

***

যুদ্ধ শেষ। মুজাহিদবাহিনী বিপুল গনীমত নিয়ে ফিরতি পথ ধরল। শায়খ আবদুল ওয়াহেদ বসরার লোকদের বলে দিলেন,

-আমি নিজে উম্মে ইবরাহীমকে ছেলের শাহাদাতের সুসংবাদ দেব। তোমরা কেউ আমার আগে তার কাছে যাবে না।

-কেন?

-ছেলের শাহাদাতের সংবাদ শোনার পর, তিনি সহ্য করতে না পেরে কান্নাকাটি করলে তার সওয়াব কমে যেতে পারে। আমি তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সংবাদটা দেব।

-তিনি স্বেচ্ছায়-ই তো সন্তানকে পাঠিয়েছেন।

-তা পাঠিয়েছেন; কিন্তু এখন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে, আগের দৃঢ়তা ধরে নাও রাখতে পারেন।

***

ঐ তো বসরা! দলে দলে লোক দৌড়ে আসছে মুজাহিদবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাতে'। অগ্রভাগেই ছিলেন উম্মে ইবরাহীম।

-আবা ওবায়েদ, আল্লাহ তা'আলা কি আমার হাদিয়া গ্রহণ করেছেন? তাহলে আনন্দ প্রকাশ করব। আমার হাদিয়া তিনি গ্রহণ না করলে, আজ আমার শোকের দিন!

-জি গ্রহণ করেছেন! বড় ভালোভাবেই গ্রহণ করেছেন আপনার হাদিয়া। ইবরাহীম এখন তার হুরবিবির সাথেই আছে! ইনশাআল্লাহ।

বুড়ি উম্মে ইবরাহীম সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন,

-আলহামদুলিল্লাহ! আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। আমার ([illegible]) কুরবানী কবুল হয়েছে।

***

পরদিন বুড়িমা দৌড়ে মসজিদে এলেন। আবদুল ওয়াহেদকে বললেন,

-ইয়া আবা ওবায়েদ, খোশখবর শুনুন।

-কিসের খোশখবর?

-গতরাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, ইবরাহীম একটা অনিন্দ্য সুন্দর বাগানে বসে আছে। মণিমুক্তাখচিত এক খাটিয়াতে। তাকে ঘিরে রেখেছে আমার বৌমারা। এটা ওটা খেতে দিচ্ছে। তার সেবা-যত্ন করছে। সামনে দেখি, একটা সবুজ গম্বুজবিশিষ্ট প্রাসাদ! ইবরাহীমের মাথায় একটা অপূর্ব তাজ। সে আমাকে বলল,

-ইয়া আম্মাহ! আপনার জন্যে সুসংবাদ আছে! আপনার দেয়া মোহরানা কবুল হয়েছে। বাসরও সম্পন্ন হয়েছে।

I Love You

ছোটখাটো একটা মানুষ; কিন্তু তেজ তার অমিত। ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ে অনেক বাঘা বাঘা পুরুষকেও হারিয়ে দিয়েছেন। অথচ কারো সাথেই চোখ তুলে কথা বলেননি। স্বভাবে খুবই নম্র। ভদ্র। শালীন। রাগহীন। সুশীল। কথা বলতেন স্পষ্ট করে। ধীরে ধীরে। মিষ্টি স্বরে। আন্তরিক ভঙ্গিতে। তার সঙ্গে প্রতিদিন প্রায় তিনবার দেখা হত। পর্দার আড়ালে অন্তরালে থাকতেন। চুপি চুপি কাজ করে যেতেন। অন্তঃসলীলা নির্ঝরের মত। বোঝা যায়, অনুভব করা যায়; দেখা যায় না।

***

আমরা যেতাম হুজুরের ভাত আনতে। মাঝেমধ্যে অন্য প্রয়োজনে এর বেশিও যেতাম। গেলেই স্মিত হেসে এগিয়ে আসতেন। ভ্রূ নাচিয়ে জানতে চাইতেন— কেন এসেছি। প্রশ্নটা এমনিই করতেন। নিজ থেকেই কিভাবে যেন বুঝে ফেলতেন। অসময়ে রুটিনের বাইরে গেলেও প্রায়ই ধরে ফেলতেন প্রয়োজনটা। বলার আগেই বাঞ্ছিত জিনিস এগিয়ে দিতেন। তখন মোবাইল ছিল না। কীভাবে যে তিনি স্বামীর চাওয়া বুঝতেন! আজ ভাবলেও অবাক লাগে! টেলিপ্যাথি? মনের অদৃশ্য সংযোগ? ভালোবাসার গভীরতা? বোঝাপড়ার গাঁটছড়া?

* * *

দুজনের সম্পর্কটাও ছিল মাশাআল্লাহ্ দেখার মত। আমাদের হুজুরদের মহলে সাধারণত সেকালে স্ত্রীরা স্বামীকে আপনি করে বলতেন। স্বামী তার স্ত্রীকে তুমি করে বলতেন। হুজুর ঘরানার বাইরেও এর চল ছিল। অল্প কিছু ব্যতিক্রম মানুষের মত আমাদের হুজুর তার জীবনসঙ্গিনীকে আপনি করে বলতেন। শুধু আপনি করেই নয়, স্ত্রীকে খুব শ্রদ্ধাও করতেন। কথায়, কাজে আচরণে সেটা ফুটে উঠত। প্রথম প্রথম বুঝিনি! পরে বিস্তারিত ঘটনা জানার পর টের পেয়েছিলাম।

* * *

আমাদের হুজুর কর্মজীবনের পুরোটা প্রত্যন্ত পাড়া-গাঁয়ের হেফজখানার শিক্ষক হিসেবে কাটিয়ে দিলেও, তিনি আগাগোড়া ছাত্র ছিলেন ঢাকা লালবাগের। দুনিয়ার আলো-বাতাস সম্পর্কে তিনি একেবারে বেখবর ছিলেন না। ভাবতে অবাক লাগে, এত যোগ্য একজন আলেম হয়েও কেন হেফজখানার শিক্ষকতা করে জীবন পার করে দিলেন? আমরা প্রায়ই দেখতাম, মাগরিবের পর কিতাব বিভাগের বড় বড় হুজুররা বড় বড় কিতাব নিয়ে হুজুরের কাছে আসতেন। আগামীকালের কঠিন জায়গাগুলো বুঝতে। হুজুর অবলীলায় সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। রীতিমত লাইন পড়ে যেত। হুজুররা কিতাব বুঝে যাওয়ার পর আসত ছাত্রদের পালা। তারাও আজকের না-বোঝা সবক বুঝতে আসত। হুজুর আমাদের খতমি ছাত্রদের পারা-আমুখতা .শোনার পাশাপাশি কঠিন কঠিন কিতাব বুঝিয়ে দিতেন। কী আশ্চর্য! হুজুর শুধু জানতে চাইতেন কোন কিতাব, কোন বহস? ব্যস্ এটুকু বললেই হত, বাকিটা হুজুর গড়গড় করে বলে দিতেন। এমন মানুষ বড় কোনো মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হওয়ার কথা ছিল। তিনি হয়ে আছেন অতি অজপাড়ার এক ছোট্ট হেফজখানার শিক্ষক! কী সুমহান আত্মনিবেদন! কী নির্মোহ কুরআনপ্রেম!

আমরা গর্বে ফেটে পড়তাম। দেখ দেখ, আমাদের হুজুর পুরো কিতাবখানাকে পড়াচ্ছে! ছাত্র-উস্তাদ সবাইকে। এত যোগ্য হয়েও তিনি কিতাব বিভাগে দরস নিতে আগ্রহী ছিলেন না। তার কথা,

-আমি কুরআন কারীম নিয়েই জীবনটা পার করে দিতে চাই! এর বেশি কিছু আমি চাই না। কিতাব বিভাগে পড়ালে কী হবে? কিছু ছেলে আলেম

হবে। হেফজখানায় পড়ালে কী হবে? কিছু ছেলে হাফেজ হবে। এরা হাফেজ হয়ে কী করবে? আলেম হবে। তাহলে? আমি তাদের আলেম হওয়ার মেহনতে শরীক আছি না? কিতাব বিভাগে পড়ালে মধ্যবর্তী মেহনতে শরীক থাকতাম, এখন আছি প্রাথমিক মেহনতে। একটা গাছ থেকে ফল লাভের জন্যে কোন অংশটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? গোড়া নাকি মধ্যবর্তী অংশ? দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

হুজুর আরও সুন্দর সুন্দর যুক্তি দিতেন।

-আমি খাই মাখন। কুরআন হলো মাখনের মত। আসল জিনিস। কিতাবখানায় যা পড়ানো হয়, সব শরাহ-নোটবই। কুরআনের নোট। আমি 'মতন—টেক্সট' পড়াই। বাকিরা নোট পড়ায়। নোট পড়ানোর চেয়ে টেক্সট বই পড়ানোর মর্যাদা বেশি। আর মর্যাদা বেশি বা কম বলে নয়, আমি সরাসরি আল্লাহর কালাম পড়তে ভালোবাসি। অন্যকে কুরআন কারীম পড়তে সহযোগিতা করতে ভালবাসি। পছন্দ করি আল্লাহর কালামের সঙ্গে থাকতে। আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসি।

***

হুজুর অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। সহজে হাসি-মজাক করতেন না। দুর্লভ কোনো মুহূর্তে, আমরা মাদরাসার মাটি কাটছি, মাদরাসার গোলআলু ক্ষেতের সার হিসেবে ব্যবহারের জন্যে পাশের বাড়ি থেকে মাথায় করে শুকনো গোবর আনছি, তখন কাজের ফাঁকে ফাঁকে জিরোবার সময়, আমাদের হুজুর একটু রাশহালকা হতেন। মুখে স্মিত মিষ্টি হাসি চকচক করত। ঝকঝকে দাঁত বিকশিত হত। বাড়ি থেকে আসত মুড়ি-নারকেল। বাড়ির ছোঁয়া পেলে হুজুর আরও প্রকাশিত হতেন। আমরা গোবরমাখা হাত মাদরাসার কূপ থেকে তোলা পানিতে ধুয়ে, মুড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম। হুজুরও সঙ্গে আছেন। এক-দুটো মুড়ি মুখে পুরছেন। ফাঁকে ফাঁকে টুকটাক গল্প করছেন। লালবাগের। ছেলেবেলার। মাদরাসার। একবার মুখ ফস্কে বলে ফেলেছিলেন,

-তোরা সবসময় বলিস, কিতাব বিভাগে দরস করাতে। আমি কিতাব বিভাগে পড়ালে, তোরা আজ এত মজা করে মাখানো মুড়ি খেতে পারতি?

-কেন হুজুর (ভয়ে ভয়ে)?

-কেন আবার? তোরা ছেলে মানুষ, তোদের কিভাবে বলি! 'ও' চায়, আমি হেফজখানাতেই পড়াই। হেফজখানা নিয়েই থাকি। কুরআনের সাথেই

জীবন আতিবাহিত করি! আর 'ওর' সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার মূল কারণও এই কুরআন।

-কীভাবে হুজুর?

-বেশি কথা বলিস না, মুড়ি খেয়ে কাজে নেমে পড়!

আমরা হতাশ! তবে গল্পের গন্ধ পেয়ে গেছি। আমরা এখন শিকারি চিতা। যেকরেই হোক গল্প উদ্ধার করতে হবে। কোন সূত্রে? সরাসরি আম্মাজির কাছে জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু যারা ঘর থেকে ভাত আনে, তারা নিতান্তই ছোট। তাদেরকে দিয়ে হবে না। আর বড়দের সঙ্গে দেখা দেওয়া দূরের কথা, আম্মাজি তাদের সঙ্গে কথাও বলেন না! তাহলে উপায়? আমরা তক্কে তক্কে রইলাম। কীভাবে গল্পটা উদ্ধার করা যায়!

***

আমাদের হুজুর নিজ লক্ষ্যপানে কতটা বিশ্বস্ত আর নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন, একটা তথ্য জানলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। লালবাগ মাদরাসায় বিশেষ কারণবশত সমস্যা দেখা দিল। কোনো কারণে মাদরাসায় অবস্থান করা সম্ভব হয়ে উঠল না। ছাত্ররা অন্য মাদরাসায় গিয়ে দাওরা পড়ল। কিন্তু হুজুরের এক কথা! জীবন শুরু করেছি লালবাগে, শেষও করব লালবাগেই। দাওরার সবক বন্ধ? ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। চিরদিন তো আর বন্ধ থাকতে পারে না। যতদিন লাগে অপেক্ষা করব। হুজুর ঠিকই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। একটা বছর বাড়িতে বসে বসে মা-বাবার খেদমত করলেন। গ্রামের মানুষের সেবাযত্ন করলেন। পিছিয়ে থাকা মানুষদের দ্বীন শিক্ষা দিলেন। বাড়ির দরজার মাদরাসায় শিক্ষকতা করলেন। হেফজখানায় পড়ালেন। এ-মাদরাসাতেই হুজুর ছেলেবেলায় পড়েছেন। হাফেজ হয়েছেন। বেড়ে উঠেছেন।

পরের বছর লালবাগের পরিস্থিতি ঠিক হলো। নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হলো দাওরা জামাতের কার্যক্রম। হুজুর যথারীতি এসে ভর্তি হলেন। পড়া শেষ করলেন। বছর শেষে আবার গ্রামে গিয়ে উঠলেন। সেই যে গ্রামে এলেন, আর কোথাও যাননি। আশেপাশের মানুষজন কত জায়গায় যায়। চট্টগ্রামের জমিয়াতুল ফালাহ ময়দানে পাকিস্তানী হুজুরদের বাৎসরিক ওয়াজ শুনতে যায়। মাওলানা আবদুল মজীদ নদীম রহ.এর ওয়াজ শুনতে। শহীদ মাওলানা যিয়াউর রহমান ফারুকী রহ.-এর জ্বালাময়ী বয়ান

শুনতে। ঢাকার ইজতেমায়। কিন্তু তিনি কোথাও যাননি। যেতে দেখিনি। সারাক্ষণ মাদরাসায়। ছুটি হলে পুরো সময় বাড়িতে। বলতেন,

-তারা (ওয়াজকারীরা) কি আমার কুরআন কারীমের চেয়ে সুন্দর করে ওয়াজ করতে পারবে? আমার জন্যে কুরআন কারীমই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলাই কাফি। স্রষ্টার ওয়াজ বাদ দিয়ে সৃষ্টির ওয়াজ শুনতে যাব কোন দুঃখে! যে কদিন ওয়াজ শোনার পেছনে ব্যয় করব, সে ক'টা দিন একটা ছেলেকে 'আলিফ-বা-তা' শেখানো আরও বেশি সওয়াবের। হেদায়াতের। রেযামন্দির। কামিয়াবির।

***

সব ক্লাশে বা হেফজখানাতেই দুয়েকজন দুষ্ট ছেলে থাকে। আমাদের সাথেও ছিল। দুষ্টকুলের শিরোমণি ছিলেন ইবরাহীম ভাই। তিনি হুজুরের কথা নিরীহ ভঙ্গিতে শুনতেন। গোবেচারা ভাব নিয়ে বড় বড় চোখে সরল চাহনিতে। পরে পুকুরপাড়ে এসে তার ঝাঁপি খুলতেন,

-আরে রাখ, ছাত্রদের খেদমত না ছাই! হুজুর আসলে কোথাও যেতে চান না অন্য এক কারণে?

-কী কারণ? কী কারণ?

-তোরা ছুটকিয়া (পোলাপান মানুষ), তোদের এসব জেনে কী লাভ?

-ইবরাহীম ভাই, আপনাকে বলতেই হবে!

-হুজুর আসলে আম্মাজিকে ছেড়ে থাকতে পারেন না বলেই কোথাও যান না।

-কীভাবে বুঝলেন?

-এসব বুঝে নিতে হয়, বোঝানো যায় না।

-আমরা কীভাবে বুঝতে পারি, একটু শিখিয়ে দিন না!

ইবরাহীম ভাই কিছু না বলে মারেফতি হাসি দিয়ে, গেঞ্জিটা খুলেই ইয়াহু বলে পুকুরে ঝাঁপ দিলেন। মানে এ বিষয়ে আর কথা বলতে চান না।

***

আমরা প্রথম দিকে সব কথা জানতাম না। পরে ভিন্ন এক সূত্রে পুরো কাহিনী জানতে পেরে থ হয়ে গিয়েছিলাম। অন্যরকম শ্রদ্ধা জেগে উঠেছিল আম্মাজির প্রতি। আমরা হুজুরের খানা আনতে গেলে আম্মাজি কিছু না কিছু খেতে দিতেনই। রাতের খাবার আনতে দুজন যেত। একজন বড়

একজন ছোট। একা একা বাঁশঝাড় পার হতে ভয় লাগত। তাই দুজনের বন্দোবস্ত। বড়জন বাড়ির ঘাটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত, ছোটজন টিফিন ক্যারিয়ার হাতে ঘরে যেত। ভাত নিয়ে ফিরত। আম্মাজি ছোটজনকে খেতে দিতেন এটাসেটা। আসার সময় বড়জনের জন্যও কিছু একটা দিয়ে দিতেন। বড়দের সঙ্গে সরাসরি দেখা না দিলেও, সবাইকে নামে চিনতেন। সবার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের থেকে জেনে নিতেন। এমনকি সবার বাড়িঘরের খবরও নিতেন। কার কী অবস্থা?

অমুকের অসুখ সেরেছে?

ওর বোনের বিয়ে কোথায় হয়েছে?

তার বাচ্চাকাচ্চা ক'জন?

ওর বোন বিয়ের পর নাইওর এসেছে?

রহীমের এক ভাই বিদেশে থাকে। দেশে কবে আসবে?

তুমি বাড়ি থেকে আসতে দুদিন দেরি করলে কেন? বাড়িতে কোনো সমস্যা? মন খারাপ হয়েছিল?

খালিদ পালিয়ে গেল কেন? হুজুর মেরেছিলেন?

সিরাজ নাকি আগামী বছর আমাদের মাদরাসা ছেড়ে চলে যাবে? ওকে একটু আসতে বলবে, আমি বুঝিয়ে বলব যাতে না যায়।

আচ্ছা, সলীমের ছোটবোনটার কাশি ছিল, ভাল হয়েছে? অষুধে কাজ হয়েছিল?

এ-ধরনের আরও কত কথা জানতে চাইতেন। হুজুর আমাদেরকে যতটা না চিনতেন, আম্মাজি তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি চিনতেন। আমরা কে কি খাই, কী পছন্দ করি! কার বাড়ির কী খবর ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা যেত, তিনি আপন মায়ের চেয়েও আমাদের মনের খবর বেশি রাখেন।

***

এই ফাঁকে বলে রাখি, আমাদের আম্মাজি ছিলেন ডাক্তার। মানে পাশ করা ডাক্তার নয়। হোমিও-এলোপ্যাথির জয়েন্ট ভেঞ্চার। মিকচার। হোমিও শিখেছেন গ্রামে থাকার প্রস্তুতি হিশেবে। আমাদের নানা মানে আম্মাজির বাবা একজন জাঁদরেল ডাক্তার ছিলেন। থাকতেন লন্ডনে। সেখানেই ডাক্তারি পাশ করেছেন। তাবলীগের সুবাদে বিভিন্ন দেশে সফরে করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে দেখা হল শায়খ আহমাদ দীদাত রহ.-এর সাথে। শায়খের কর্মপদ্ধতিতে খুব মুগ্ধ হলেন। অসহায় গরীব কালো

মানিকদেরকে ঈমানের পথে আনতে হবে। লন্ডনে মারকাযের মুরুব্বিদের সঙ্গে মশওয়ারা করে, উড়াল দিলেন ডারবানের উদ্দেশ্যে। সপরিবারে। সে অনেক আগের কথা। আমরা পরে এসব ইতিহাস উদ্ধার করেছি। নানাজানের কাছ থেকেই। বছরে একবার মেয়েকে দেখতে আসতেনই। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও।

সামান্য পেট খারাপ হলেই আমরা আম্মাজির কাছে ছুটে যেতাম। তিনি মিষ্টি মিষ্টি সাগুর দানা হোমিও পুরিয়া দিতেন। আমরা বীরদর্পে চুষতে চুষতে ফিরতাম। বাড়ি থেকে দেরি করে এলে, হুজুরের হাত থেকে নিস্তার ছিল না। তাঁর কঠিন পিটুনিতে দেরি করে আসার ভূত বাপ বাপ করে পালাত। দুষ্ট ছেলের দল, একটা অভিনব উপায় বের করেছিল। হুজুর যখন মাদরাসায় থাকতেন, তখন তারা বাড়ি থেকে ফিরত। সরাসরি আম্মাাজির কাছে গিয়ে উঠত। কঁকিয়ে কঁকিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলত, নিজের অসুখের কথা। এখনও অসুখ পুরোপুরি সারেনি। শুধু পড়ার মায়ায় দুর্বল শরীর নিয়েই চলে এসেছি। অসুখ না ছাই! আম্মাজি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

-দেখি দেখি হাঁ কর, এক ডোজ খাইয়ে দিই।

-না না আম্মাজি, তিতা সিরাপ খাব না।

-তাহলে কী খাবি?

-মিষ্টিটা খাব। টুকটুকির ডিমের মত ওটা।

ওষুধ খাওয়া শেষ। দুষ্ট ছেলে তখনো বসে আছে। ওঠার নামগন্ধ নেই। বড় ঘরে পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে!

-কিরে, মাদরাসায় যাবি না?

-আম্মাজি খুব দুর্বল লাগছে!

-আচ্ছা শুয়ে থাক! বিকেলের দিকে গেলেও হবে।

দুপুরের দিকে হুজুর ঘরে এলেন। রোগীকে শোয়া দেখে কিছু বললেন না। চুপচাপ গোসল সেরে চলে গেলেন। হুজুর যাওয়ার সাথে সাথেই রোগী সুস্থ। দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে। আম্মাজির সঙ্গে গল্প জুড়েছে।

-আম্মাজি, নারকেল গাছটা পরিষ্কার করে দিই? পুকুরের কচুরিপানাগুলো সাফ করে দিই?

-আহা, তুই না অসুস্থ?

-এখন একটু ভাল লাগছে!

* * *

একটু পরে রোগী সুস্থ হয়ে মাদরাসায় ফিরল। আমরা মুখ টিপে হাসছি। হুজুরও হয়তো ধরে ফেলেছেন তার কারসাজি। আম্মাজিও ধরতে পারতেন; কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে দিতেন না। এক অসামান্য ভদ্রতাবোধ কাজ করত তার মধ্যে। অপত্য স্নেহ-মমতা চুইয়ে চুইয়ে পড়ত। আমরা প্রায় সত্তরজন তালিবে ইলম ছিলাম হেফজখানায়। সবাই ছিলাম তার মমতার কাঙাল। আমরা ছোটরা তো বটেই; বড় যারা দেখা দিতে পারত না, তারাও অদৃশ্য মমতামাধুর্যে আপ্লুত হত।

শুধু কি আমাদের উৎপাত সামলাতে হত তাকে? গ্রামের মহিলারা পারলে আম্মাজির কাছে সারাদিন পড়ে থাকে। প্রাথমিক চিকিৎসার সবটা তিনি বাবার কাছ থেকে শিখে এসেছিলেন। ইঞ্জেকশান পুশ করা, স্যালাইন দেওয়া, প্রেশার মাপা ইত্যাদি। এলোপ্যাথির মৌলিক জ্ঞানগুলো ছিল তার একদম নখদর্পণে। প্রয়োজনীয় সব ওষুধের নাম জানতেন। গোটা গোটা ইংরেজি অক্ষরে প্রেসক্রিপশন লিখতে পারতেন। হোমিও চিকিৎসায় হাতের যশ রীতিমত দশগ্রাম ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নিজে থেকে যে ওষুধ দিতেন, সেটার কোনো দাম নিতেন না। ডাক্তারির জন্য তো নয়ই।

এত টাকার ওষুধ কেনার টাকা কোথায় পেতেন? বাবা ব্রিটেনের সরকারি ডাক্তার। অনেক টাকা মাইনে পান। এছাড়া তার অন্য ব্যবসাও ছিল। ডারবানে গিয়েও তার আয়-রোজগার ভালোই হত। মেয়ের জন্যে তিনি হাত খুলে টাকা পাঠাতেন। আর মেয়ে সব টাকা গরীব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। মাদরাসার অসহায় তালিবে ইলমদের পেছনে ব্যয় করতেন। নিজেরা চলতেন খুবই সাদাসিধাভাবে। পরনের কাপড় পুরনো। হুজুরও তাই। তবে তা হত খুবই পরিচ্ছন্ন। বাড়ির প্রতিটি অঙ্গন থেকে রুচি, পরিপাট্য আর আভিজাত্য ঠিকরে বেরুত।

***

হুজুর আর আম্মাজি, এই মানিকজোড় একসাথে কিভাবে হল? এটা বের করতে হবে। অনেক চিন্তা করেও উপায় বের করা যাচ্ছিল না। আম্মাজি একটা কাজ করতেন,

আমাদের সঙ্গে ছোট ছোট দুষ্ট ছেলে যারা পড়ত, মাদরাসায় এনে দিলেই পালিয়ে যেত, আবার ধরে আনা হত। তিনি দুষ্ট ছেলের মা বা বড় বোনকে নিজের কাছে এনে রাখতেন। ছেলেটার মন টিকে যাওয়া পর্যন্ত আম্মু বা

আপু থাকত এ-বাড়িতে। আবার কোনো ছেলে ঘন ঘন অসুস্থ হলে, তার আম্মুকেও আনিয়ে নিতেন। এখানে চিকিৎসা করতেন। সেবা-শুশ্রূষা করত আপন মা। সবদিক রক্ষা হত। আম্মাজি অসুস্থ ছেলেদেরকে নিজে বসে বসে কুরআন কারীম পড়ে শোনাতেন। চেষ্টা করতেন সবক মুখস্থ করিয়ে দিতে। ছেলেটা শুয়ে থাকত, আম্মাজি বারবার একই আয়াত পড়ে শোনাতেন।

কুরআন কারীমের অনেকগুলো পৃষ্ঠায় আজো আম্মাজির মায়াভরা চেহারা লেপ্টে আছে। তার সুন্দর মিহি কণ্ঠের সুরের আবেশ মাখানো আছে। আমাদের সৌভাগ্য দেখে, বড় ছেলেরা রীতিমত হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেত। তাদের একটাই আফসোস,

-কেন যে এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেলাম!

আর আমাদের ছোটদেরকে সারাক্ষণ একটা ভয় কুরে কুরে খেত,

-এই বুঝি বড় হয়ে গেলাম রে! এই বুঝি গোঁফের রেখা ফুটে উঠল রে! তাহলেই সব শেষ। পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ উধাও।

এমনও হয়েছে, রমজানের পর একজন বড় হয়ে মাদরাসায় এসেছে। আম্মাজি তাকে ঘরে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। নিষেধাজ্ঞা শুনেই ছেলেটির সে কি হাউমাউ করা কান্না! আপন মা মরলেও এভাবে কাঁদত কি-না সন্দেহ! ছেলের কান্না দেখে আম্মাজিও কেঁদেছেন। কিন্তু নমনীয় হননি। পর্দা করা ফরজ। এখানে মন খারাপ হলেও আপোষ নেই। নমনীয়তা নেই। ছাড় নেই। পিছু হটা নেই। আল্লাহ সবার আগে।

***

আম্মাজি লন্ডনে ছিলেন। ডারবানে ছিলেন। পৃথিবীর আরও কত বড় বড় শহর দেখেছেন। এমনকি হজও করেছেন। স্বামী তখনো হজ করতে পারেননি; কিন্তু নিজের জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে কখনো কিছু প্রকাশ করতেন না। না কথায়, না কাজে। গ্রামের মেয়েদেরকে লিখতে-পড়তে শেখাতেন। ধরে এনে এনে বাংলা পড়তে শেখাতেন। কুরআন শরীফ পড়াতেন। আমরা জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজে হাফেজ কি-না, স্বীকার করতেন না। কিন্তু আমরা বিলক্ষণ জানতাম, তিনি হাফেজ। বিয়ের পর হুজুরের কাছে হেফজ শুনিয়েছেন।

***

যাদের বাড়ি মাদরাসার আশপাশে ছিল, তাদের বাড়িতে মা-বোন কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে, তিনি নিজের কাছে আনিয়ে নিতেন। দীর্ঘস্থায়ী অসুখ হলে, বিস্তারিত জেনে ডারবানে বাবার কাছে চিঠি পাঠাতেন। সুদূর আফ্রিকা থেকে ব্যবস্থাপত্র আসত। বড় কোনো শহর থেকে ওষুধ আনিয়ে নিতে হত। আর যদি ওষুধ বা চিকিৎসা দেশে সম্ভব না হত, তাহলে নানাজি বছরশেষে মেয়েকে দেখতে আসার সময় বিভিন্ন ওষুধ নিয়ে আসতেন। নানাজির জীবনও ছিল বিচিত্র। তাকে নিয়েও একটা বই লিখে ফেলা যাবে। নানাজি আসার সময় মেয়ের জন্যে তো বটেই, আমরা নাতিদের জন্যও চকলেট নিয়ে আসতেন। আম্মাজির গ্রামের বাড়ি মাদরাসা এলাকাতেই। একটু দূরে চাচা-জেঠা জ্ঞাতিগোষ্ঠিরা থাকত; কিন্তু আম্মাজিকে কখনই তাদের বাড়িতে বেড়াতে যেতে দেখিনি। তবে যোগাযোগ রাখতেন। চিকিৎসাসহ বিভিন্ন সাহায্য দিয়ে সবসময় আদর-আবদার রক্ষা করতেন।

***

আমাদের হুজুর ছিলেন ছোটখাটো অবয়বের। আম্মাজিও তাই। দুই 'ছোটাছুটি-টোনাটুনি'র ভালোবাসার সংসার। বিয়ের ঘটনা আমরা উদ্ধার করেছি দুটো সূত্রে। আম্মাজির দাদার বাড়ি আর আমাদের একজন সঙ্গীর মায়ের সূত্রে। আমাদের সাথী ছিল ঢাকার। হুজুর লালবাগে পড়ার সময় কিছুদিন এক বাসায় লজিং থেকেছিলেন। জায়গীর বাড়ির ছেলে-মেয়েদের পড়াতেন। গ্রামে চলে আসার পরও সে বাসার সঙ্গে হুজুরের ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল। হুজুরের এক ছাত্র ছিল। সে ছাত্র তার ছেলেকে হেফজ পড়ার জন্যে পাঠালেন গ্রামে। নিজের ওস্তাদের কাছে। তখন ছেলেটার সঙ্গে মাও এসেছিলেন। কিছুদিন থেকে গেছেন। তারপর আরও কয়েকবার এসেছেন। সেই ঢাকাইয়া মা-ই আম্মাজির থেকে কথা আদায় করেছেন। গ্রামের বড়দের প্রায় সবাই বিয়ের বৃত্তান্ত জানত। আমরাই ছিলাম বেখবর। এক সাথীর থেকে আমরা ঘটনাটা শুনেছি। সংবাদটা ঢাকা হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

***

বিয়ের আগে, আম্মাজির দাদু তখনো বেঁচে আছেন। জীবনের অন্তিম ইচ্ছা, একটিবারের জন্যে হলেও নাতনির মুখ দেখবেন। ডারবান থেকে উড়ে

এলেন ডাক্তার-পরিবারে। দীর্ঘ সময় গ্রামে থাকলেন। ঘটনা ঘটেছিল, হুজুর যখন মেশকাত পড়ে গ্রামে ছিলেন সে বছর। ডাক্তার সাহেব অনেকদিন পর দেশে এসেছেন। বিদেশে থাকাবস্থায় নিয়মিত এ মাদরাসার জন্যে সাহায্য পাঠিয়েছেন। আশপাশের অনেকগুলো গ্রামের মধ্যে মাদরাসা বলতে শুধু এটাই। গ্রামের মসজিদগুলো সংস্কার করার চেষ্টা করেছেন। ইমাম সাহেবদের মাসিক সম্মানী বাবদ কিছু অর্থ পাঠানোর চেষ্টা করেছেন। তাবলীগের কাজ জোরদার করার জন্যে অনেক মেহনত করেছেন। বাড়ি বাড়ি নলকূপ বসিয়ে দিয়েছেন। নিজের মা-বাবার সুবিধার জন্যে যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি বোধহয় আয়ের সিংহভাগ বাংলাদেশেই পাঠিয়ে দিতেন।

ডাক্তার সাহেব মাদরাসায় এলেন। গ্রামের মাদরাসায় ভালো শিক্ষক পাওয়া বড় দায়। কিন্তু আমাদের হুজুরের মেহনত দেখে তিনি ভীষণ মুগ্ধ। যখন শুনলেন, আমাদের হুজুর পড়ালেখা শেষ না করেই গ্রামে চলে এসেছেন। নানাজি সরাসরি হুজুরের কাছে এলেন। কথাবার্তা বলার পর মূল প্রসঙ্গে এলেন,

-আপনি আর একটা বছরের পড়া শেষ করলেন না যে?

-শেষ করব, ইনশাআল্লাহ!

-কখন?

-আগামী বছর।

-কোথায়?

-লালবাগে। সেখানে দাওরার দরস শুরু হলে।

নানাজি প্রশ্ন করে করে সব জেনে নিলেন। তার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। একটা মানুষ নিজের ওস্তাদদের প্রতি এতটা বিশ্বস্ত থাকতে পারে? নিজের মাদরাসার প্রতি এতটা নিষ্ঠ থাকতে পারে? নিজের জীবনের অতি মূল্যবান একটা বছর বাদ দিয়ে হলেও? এটা বোকামি, না-কি ওস্তাদ ও মাদরাসার প্রতি অপরিসীম ভালবাসা? দ্বিতীয়টাই হবে।

***

ডাক্তার সাহেব কথা বলে ঘরে ফিরে গেলেন। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে। যাকে সামনে পান তাকেই হুজুরের কথা বলেন। গ্রামের লোক আগ থেকেই হুজুরের জন্যে জান-পরান। তারা একগুণকে দশগুণ চড়িয়ে

ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ডাক্তার সাহেবের কাছে প্রচার করল। বাড়িতে দুপুরে খেতে বসে নিজের বিবি-কন্যাদেরকেও সবিস্তারে-সালংকারে হুজুরের কথা বললেন। তারা অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করল,

-এ যে অবিশ্বাস্য! একটা ছেলে এতটা বিশ্বস্ত কিভাবে হতে পারে? আর সারাদিন মাদরাসায় পড়ায়, একটা টাকাও নেয় না? তাহলে সে চলে কী করে?

নানাজি স্ত্রী-কন্যার প্রশ্নের উত্তরে বললেন,

-প্রশ্নটা আমিও তাকে করেছিলাম। সে বলেছে,

আমি এখনো ছাত্র মানুষ। টাকা দিয়ে আমি কী করব?

-কেন আম্মা-আব্বাকে দেবেন?

-তাদের প্রয়োজন নেই। আর আমি তো নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষক নই। আল্লাহর কালাম পড়াব, এর বিনিময় নিতে যাব কেন? হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন থাকত তাহলে নিতাম। শুধু শুধু গরিব মাদরাসার টাকা খরচ করব কেন?

কথাগুলো আম্মাজির মনে ভীষণ রেখাপাত করল। এমন সরল নির্মোহ যুবক সচরাচর দেখা যায় না। নিজ উদ্যোগে খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করলেন। মাকে নিয়ে একবার হুজুরদের বাড়িতে বেড়াতেও গেলেন। বাবাকে দিয়ে হুজুরকে দাওয়াত দেওয়ালেন। হুজুরের এককথা,

-আমি কারো বাড়িতে দাওয়াত খাই না।

-আমার স্ত্রী আর কন্যা বড় আবদার করেছে আপনাকে একবেলা ডালভাত খাওয়াবে!

অনেক পীড়াপীড়ির পর হুজুর রাজি হলেন। তবে সময় দিলেন বেশ কিছুদিন পর। মাদরাসা ছুটি থাকবে তখন।

-তখন কেন? এখন হলে সমস্যা কী?

-আমি মাদরাসার একজন শিক্ষক হিশেবে দাওয়াত খাব না। এটা আমার জীবনের প্রতিজ্ঞা। মাদরাসা বন্ধ থাকলে, তখন আমি বাড়ির মানুষ। আপনি এলাকার মুরুব্বি। আত্মীয়। সে সুবাদে দাওয়াত রক্ষা করব।

-এখনই সেটা হতে পারে না?

-জি পারে। তবে ছাত্ররা মনে করতে পারে, আমি হুজুর হিশেবেই দাওয়াত খেতে গিয়েছি। তারাও ভবিষ্যতে দাওয়াত খেয়ে বেড়ানোর ছুতো পেয়ে যাবে।

-আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যেভাবে ভাল মনে করেন।

* * *

সেই শুরু। আম্মাজি নানা সূত্রে হুজুরের খবর সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। বাবাকে পাঠান মাদরাসায়। তালিবে ইলমদের জন্যে খাবারের আয়োজন করেন। তাদের জন্যে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বাড়িতে ডেকে পাঠান। নানা প্রশ্ন করে মাদরাসার হাল-অবস্থা জানেন। তার একবার শখ জাগল, হুজুরের জন্য কিছু হাদিয়া পাঠাবেন। কী পাঠানো যায়? হুজুর আবার হাদিয়া গ্রহণ করেন না। মুশকিলই হয়ে গেল। যে নিতে চায় না, তাকে দেওয়া কঠিন; কিন্তু সব হৃদয়েরই একটা দরজা থাকে। সেটা খুঁজে বের করতে হয়। বুদ্ধি থাকলে বের করা কঠিন কিছু নয়। বাড়িতে মদীনার খেজুর আর যমযমের পানি ছিল। দাদুর জন্য আনা হয়েছিল। সেখান থেকে কিছু হাদিয়া পাঠালেন। মায়ের নাম করে। এ হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করা মানে, মক্কা-মদীনাকে অপমান করা। হুজুর পড়লেন বিপাকে! অবশ্যই এ-হাদিয়া নিতে হবে।

কিছুদিন পর আবার হাদিয়া। এবার এল গরীব ছাত্রদের জন্যে কুরআন শরীফ। ডাক্তার সাহেব মাঝেমধ্যে ঢাকা যেতেন। তাকে দিয়ে আনিয়েছেন। সাথে সাথে হুজুরের জন্যও একটা। এটাও ফিরিয়ে দেয়া যায় না। হুজুরের মায়ের জন্যে সুন্দর একটা শাড়ি! বাবার জন্যে জামা-লুঙ্গি।

বছর শেষ হল। হুজুর লালবাগ মাদরাসায় চলে গেলেন। এদিকে ডাক্তার সাহেবেরও ছুটি শেষ হয়ে এল। লন্ডন হয়ে ডারবানে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আম্মাজি গোঁ ধরেছিলেন,

-আমি আরও কিছুদিন এখানে থেকে যেতে চাই।

সবাই হা হা করে উঠল। এ আবার কেমন কথা। বাবা-মা-ভাইবোন ছেড়ে একা একা কীভাবে থাকবে? পড়াশোনা বাদ দিয়ে?

-কেন দাদুর কাছে থাকব?

দাদুই নাতনিকে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন। শত অজুহাত-আপত্তি ধোপে টিকল না। যাওয়ার আগে একটা কাজ করে গেলেন। মাকে নিয়ে আবার হুজুরদের বাড়িতে গেলেন। পুরো একটা দিন বেড়ালেন। একান্তে হুজুরের মায়ের সঙ্গে কথা বললেন। নিজের মাও টের পেল না, মেয়ে কী নিয়ে কথা বলেছে। এবার ফেরা যায়। চলে গেলেন চোখের জল মুছতে মুছতে।

পরের বছর দাদু মারা গেলেন। খবর শুনে ডাক্তার সাহেব বাড়ির পথে রওয়ানা দিলেন। মেয়েও বায়না ধরল, যাবে। বাবা নিতে রাজি নন।

-ওখানে দাদু নেই, তুই একা গিয়ে কী করবি?

-দাদু না থাক, দাদুর বাড়ি আছে। আরও কত কিছু আছে দেখার মত। আমাকে নিয়ে চলুন!

-তুই গেলে তোর মাকেও নিতে হবে। তোর ভাইবোনদেরকেও নিতে হবে। বছর বছর এত লম্বা জার্নি প্রায় অসম্ভব।

-আব্বু, আর কষ্ট করতে হবে না। এটাই শেষবার।

-আচ্ছা ঠিক আছে, চল। কেন যে এত কষ্ট করে যেতে চাচ্ছিস, বুঝতে পারছি না। আমি যাচ্ছি অল্প ক'টা দিনের জন্যে। বাড়ির সহায়-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে চলে আসব। আমার ভাগের জমি-জিরেতের বিলি-ব্যবস্থা করব। বড়জোর হপ্তাহদুয়েক।

-তা হোক। আমাকে নিয়ে চলুন।

***

ডাক্তারদম্পতির আগমনে গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। আম্মাজি এসেই আগের মত মাদরাসার ছাত্রদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একফাঁকে হুজুরের বাড়ি থেকে ঘুরে এলেন। মাকে নিয়ে আরও বেশ কিছু জায়গায় গেলেন। ফিরে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসছে। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করলেন। সময় বুঝে একদিন মায়ের কাছে বললেন,

-আমি এখানে থেকে যেতে চাই। এখানে থাকতে আমার ভালো লাগবে।

-বলছিস কি তুই? আমি তোকে ছেড়ে থাকব কী করে? আর এখানে কোথায় থাকবি?

-চেষ্টা করলে থাকার জায়গার অভাব হবে?

-তুই আমাকে একটু খুলে বল।

-আমি আর কী খুলে বলব। তুমি মেজ চাচীকে সঙ্গে নিয়ে বিকেলে একজনের সঙ্গে দেখা করে আসবে। সেখান থেকে ফেরার পর যা বলার বলব।

***

মেজ চাচীর সঙ্গে বিকেলে মাকে পাঠালেন। হুজুরের মায়ের কাছে। হুজুরের মা বললেন,

-আপা, আপনি কিছু মনে না করলে, একটা কথা বলি। আমি জানি আমার কথাটা আপনার কাছে স্বাভাবিক মনে হবে না। তবুও ভুল হলে নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

-না না, আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন।

-আপনার মেয়েটাকে কি আমিও মেয়ে হিশেবে পেতে পারি?

-সে তো আপনার মেয়ের মতোই। আপনাকে কী যে পছন্দ করে, বলে শেষ করার নয়।

-সে তো আছেই! আরেকটু পাকাপোক্তভাবে মেয়ে বানাতে চাইলে?

-ও আচ্ছা! আমি কী বোকা, এতক্ষণে বুঝেছি। কিন্তু আপা, এটা কি সম্ভব?

-কেন সম্ভব নয়? হ্যাঁ, আপনারা বিদেশে থাকবেন। ও দেশে থাকবে, ব্যাপারটা বেখাপ্পা। তারপরও একটা আবদার করলাম। আপনি গ্রহণ করতে পারেন, নাও করতে পারেন। আপনার বাগানে সুন্দর সুরভিত একটা ফুল ফুটেছে। আমার সেটা পাওয়ার লোভ জাগতেই পারে। আপনি ফুলের মালী ও মালিক। আমাকেও ওই ফুলের সুবাস নিতে দেওয়া-না দেওয়া আপনার এখতিয়ার।

-আচ্ছা সে কি আপনাকে কিছু বলেছে?

-আমাকে কিছু বলতে নিষেধ করেছে; কিন্তু আপনার সরাসরি প্রশ্নে আমি মিথ্যা বলি কী করে! আমি তার কাছে পরে ক্ষমা চেয়ে নেব। জি, সে গতবার যাওয়ার সময়ই বলেছে।

-কী বলেছিল?

-সে বলেছিল, আমি আপনার সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকতে চাইলে, আপনি রাখবেন?

আমি সাথে সাথে মেয়ের অভিপ্রায় বুঝে গেলাম। সীমাহীন অবাক হয়েছিলাম। এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব আমাকে বিহ্বল করে দিয়েছিল। আমার পাগল ছেলেটার জন্যে মনে মনে পাত্রী পাত্রী খুঁজে আমি হয়রান। আর এদিকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে গায়েবি ইন্তেজাম করে রেখেছেন, বান্দার পক্ষে এসব বোঝা দায়। আমি সানন্দে সম্মতি জানিয়েছিলাম।

-আপনার ছেলে কি জানে?

-জি জানে। আপনারা চলে যাওয়ার পর, ও কুরবানির ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। তখন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম। ছেলেও শুনে আকাশ থেকে

পড়ল! ছেলের গায়ে তখন আপনার মেয়ের দেয়া কাপড় দিয়ে সেলাই করা পাঞ্জাবি। কাপড়টা ফাতিমা দিয়েছিল ছেলের বাবার জন্য; কিন্তু দর্জির দোকানে গিয়ে দেখা গেল, পাঞ্জাবির কাপড় একজনের নয়; দুজনের। মেয়েটা খুবই বুদ্ধিমতী! সে জানত, বাবার সঙ্গে ছেলেও দোকানে যাবে। বাবার পীড়াপীড়িতে ছেলেও পাঞ্জাবি সেলাই করতে বাধ্য হল।

***

মা বাড়িতে ফিরে সব কথা খুলে বললেন। ডাক্তার সাহেব সব শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পাত্র হিশেবে খুবই যোগ্য! কিন্তু মেয়েটা আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছে না তো! আজীবন বিলাসের মধ্যে না থাকলেও, অভাবের মধ্যেও তো ছিল না। তাছাড়া এভাবে গ্রামীণ পরিবেশেও ছিল না। ছিল বিশ্বের অন্যতম সেরা শহরে। সেরা শিক্ষালয়ে পড়াশোনা করেছে। এখানে মন টিকবে? মা-বাবাকে ছেড়ে? মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। মেয়ের এক কথা। সাফ সাফ বক্তব্য,

-আব্বু, আমি শাদামাঠাভাবে জীবনটা কাটাতে চাই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকতে চাই। তাদের জন্য কিছু করতে চাই। আপনি দয়া করে আমাকে বাধা দেবেন না।

-কিন্তু মা, তোরা দুজন দুই মেরুর। তোরা এখন পর্যন্ত একে অপরকে চিনিস না, জানিসও না।

-উনি আমাকে না চিনলেও, আমি উনাকে ভাল করে চেনার চেষ্টা করেছি। আপনি খেয়াল করেননি, আমি আম্মুকে নিয়ে বারবার তার বাড়িতে গিয়েছি?

-তুই চাইলেও ও কি তোকে পছন্দ করবে? ওরা অত্যন্ত ধার্মিক পরিবারের মানুষ।

-আমরাও তো ধর্ম মেনে চলার চেষ্টা করি। বোঝার চেষ্টা করি। আর আমার মধ্যে কোনো ঘাটতি থাকলে, সেটা পূরণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব। আর উনিও রাজি। তার মায়ের কাছ থেকে জেনেছি।

বাবার পর এল চাচা-জেঠাদের বাধা। তারা এটাকে অপমান হিশেবে নিল। হেফজখানার একজন সাধারণ শিক্ষককে বিয়ে করবে তাদের বাড়ির রাজকন্যা! কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। যেভাবেই হোক ঠেকাতে হবে। বিয়ে করতে চাইলে আমাদের যোগ্য ছেলেরা আছে। গ্রামে আরও

অবস্থাপন্ন পরিবার আছে। দেশে কি পাত্রের অভাব? একটা ফকির এ-বাড়ির জামাই হবে? বড় জেঠা তো এর বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন।

***

তাদের বিরোধের মুখে বাবা-মা যাওবা একটু নিমরাজি ছিলেন, তারাও এবার ভড়কে গেলেন। এমন হট্টগোলের মধ্যে আম্মাজি চারদিকে অন্ধকার দেখছিলেন। তখন এক অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে প্রবল প্রতিরোধ এল। সবাই ভেবেছিল এমন বাধার মুখে হুজুর পিছু হটে যাবেন। লজ্জায় না হয়, ভদ্রতায় বা সংকোচে কিংবা অপমানে। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন, 'একজন কুরআনের শিক্ষক বলে ও-বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা তার কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়া অপমানজনক মনে করছে, বিষয়টা তার আত্মসম্মানে লাগল। তিনি নিজের বাবাকে নিয়ে সরাসরি ডাক্তার সাহেবের কাছে প্রস্তাব পাড়লেন। চাচা-জেঠাদের রক্তচক্ষুর সামনে দিয়েই তার ঘরে গেলেন। আবার বেরিয়েও এলেন। আসার সময় বড় চাচার সাথেও কথা বলে এলেন। পেছনে যত যাই হোক, হুজুরকে গ্রামের সবাই একটু অন্যরকম সমীহ করে চলে। বয়সে অল্প হলেও সম্ভ্রম করে।

পাত্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর ডাক্তার সাহেবের মনে সাহস ফিরে এল। তিনি ভাইদের গোমড়া মুখের উপর দিয়েই বিয়ের আয়োজন শুরু করলেন। কী আর করা, মেয়েকে যখন ফেরানো যাচ্ছে না! রাজি হয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সে সুখী হলে, আমাদের আপত্তি থাকবে কেন?

***

হুজুরের বিরুদ্ধে কিছু দুষ্ট লোক নেতিবাচক কথা ছড়িয়েছিল। হুজুর এসবকে পাত্তা দেননি। হুজুরের সঙ্গে পাত্রীর বিয়ের আগে দেখাই হয়নি। ডাক্তার সাহেব দেখার প্রস্তাব দিলে হুজুর বলেছেন,

-দেখা সুন্নাত! যদি প্রয়োজন মনে করা হয়। আমি প্রয়োজন মনে করছি না।

-আমার মেয়ের যদি কোনো খুঁত থাকে? পরে ধরা পড়লে?

-আম্মা পাত্রী দেখেছেন। উনি না দেখলেও, আমি দেখার প্রয়োজন বোধ করতাম না। যে মানুষ রাজকন্যা হয়েও আমার মত অতিনগণ্য একজনকে বিয়ে করতে স্বেচ্ছায় আগ্রহী হয়েছে, এত বাধার মুখেও পাহাড়ের মত অটল থেকেছে, সাত সমুদ্র-তের নদী পাড়ি দিয়ে একবছরের মাথায় আবার

এসেছে, তাকে দেখতে যাব কেন? তিনি যদি অন্ধ-মূক-বধিরও হন, আমি তাকে আজীবন মাথার উপরে তুলে রাখব। তিনি আমার প্রতি আস্থা রেখেছেন, আমি আজীবন এই আস্থার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করে যাব। ইনশাআল্লাহ!

ডাক্তার সাহেব খুবই প্রীত হলেন হুজুরের জবাব শুনে। বললেন,

-তোমাকে তুমি করেই বলি। খোলাখুলিই বলছি, তোমার কোন বিষয়টা আমার মেয়েকে বেশি মুগ্ধ করেছে জানো?

-কোন বিষয়টা?

-এই যে তুমি নিজের প্রিয় মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত থাকো, সেটা!

-সেটা উনি কিভাবে জানলেন?

-তুমি নিজের ওস্তাদগণের কাছে পড়বে বলে, নিজের মাদরাসায় পাঠপর্ব শেষ করার জন্যে, একবছর দাওরা পড়া পিছিয়ে দিলে না! মেয়ের মা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুই কী দেখে মজে গেলি বল দেখি? মেয়ে বলেছে, যে মানুষটা নিজের আপন মানুষ এবং আপন স্থানের প্রতি এতটা বিশ্বস্ত থাকতে পারে, সে মানুষ একজন খাঁটি মানুষ না হয়ে পারে না। টাকা-পয়সার লোভ কার না থাকে, কিন্তু তোমার মধ্যে এটা নেই দেখে, সে আরও চমৎকৃত। নিজের ভবিষ্যত কষ্টকর হলেও, এমন মানুষের সঙ্গে থেকে সুখী হওয়া যাবে। স্বস্তি পাওয়া যাবে। নাইবা হল ধন-ঐশ্বর্য, লন্ডন-আমেরিকায় থাকা। এ-মানুষটার পাশে থেকে তাকে প্রেরণা যুগিয়ে যেতে পারা, রাজরানী হওয়ার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আর টাকা-পয়সার অভাবও হবে না। আব্বুর এখানে অনেক জমি-জমা। সেগুলোর ফসল কে তুলবে? ভাইবোনেরা কেউ এখানে থাকবে না। আসবে না। আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর আব্বুর জমি-জমা না হলেও সমস্যা নেই। সেগুলো উপরি হিশেবে থাকবে। উনি মাদরাসা থেকে যৎসামান্য মাসোহারা পান, সেটা দিয়েই আমাদের জীবন সুন্দর কেটে যাবে। আল্লাহর কাছে দু'আ করেছি।

***

হুজুর মাদরাসায় যে কামরায় থাকতেন, সেটার একটাই দরজা। বিয়ের আগ পর্যন্ত একটা দরজা দিয়েই কাজ চলত। বিয়ের পর, এক ছুটি শেষে তালিবে ইলমরা মাদরাসায় ফিরে দেখে, কামরার পেছন দিকে আরেকটা নতুন দরজা কাটা হয়েছে। মুলি বাঁশের বেড়া কেটে দরজা বানানো খুব

কঠিন কিছু নয়। ফিসফাস শুরু হল। এই দরজার মাহাত্ম্য কী? পরে আবিষ্কার হলো, এই দরজা 'স্বর্গে' যাবার সিঁড়ি। হুজুর সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে চুপিচুপি এই দরজা দিয়ে ঘরে যেতেন। ছাত্ররা ভান করত, তারা কিছুই জানে না, কিছুই দেখে না।

পেছন দরজা দিয়ে বের হয়ে একটু হাঁটলেই হুজুরের বাড়ি। মর্ত্য থেকে সোজা স্বর্গে। শোনা কথা, ছুটির দিনগুলোতে, হুজুরকে কোনো কোনো দুষ্ট ছেলে গভীর রাতে পুকুরপাড়ে বসে থাকতেও দেখেছে। চাঁদের আবছা আলোয়। পাশে আরও কেউও হয়তো থাকত। নিবিড় হয়ে। প্রায় জড়াজড়ি করে। কোনো কোনো রাতে পুকুরে জাল মারতে দেখা যেত। সঙ্গে আরেকজন মাছের ডুলা নিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বড় মাছ উঠলে আনন্দে নেচে উঠছেন। একবার ঘটেছে মজার ঘটনা। হুজুর রাতের ছায়াসঙ্গীকে জাল মারা শেখাচ্ছেন। কিন্তু ছায়াসঙ্গী কিছুতেই জালটা ঠিকমত ফেলতে পারছেন না। বেড়াছেড়া লেগে যায়। এবার হুজুর বিপরীত পাশ থেকে জড়িয়ে ধরলেন। জালটা সঙ্গিনীর ডানহাতের কনুইতে আটকে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন। কিছু একটাতে বোধহয় সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। জালের সঙ্গে সাথে 'ওরা দুজন'ও ঝপ্পাস করে পানিতে।

দুষ্ট ছেলের দল বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিল। চাঁদের আলোতে আবছা দেখা যায়। দুজনকে একসঙ্গে পানিতে পড়ে যেতে দেখে, এক বোকা চিৎকার করে উঠলো,

-'আম্মাজি হইরে (পুকুরে) হই গেছে! আম্মাজি হইরে হই গেছে'!

সে উদ্ধার করার জন্যে ছুটে যেতে উদ্যত হলো। যেন নিজে সে না গেলে ওনারা দুজন ডুবে মরবেন। বাকিরা তাকে খপ করে ধরে নিরস্ত করল।

-এ্যাই ব্যাটা, সব শেষ করে দিবি না-কি? দিয়েছিলি তো অবস্থান ফাঁস করে।

এই দুষ্ট ছেলেগুলোকে কে বোঝাবে, এভাবে উঁকি দিয়ে দেখা ঠিক নয়। গুনাহ হয়। তোদের জ্বালায় দুজনে রাতের বেলায় বের হয়েছে। তাতেও নিস্তার মিলেনি। তোরা ওঁৎ পেতে আছিস।

***

হুজুরের টিফিন ক্যারিয়ারটা ছিল চার বাটির। এক বাটিতে ভাত, সঙ্গে ভর্তা। এক বাটিতে ঘন বা পাতলা ডাল। আরেক বাটিতে ভালমন্দ কিছু একটা। প্রতিবেলায় একটা বাটির জায়গা ফাঁকা থাকত। তিনবাটি দিয়েই

খাবার আনা-নেওয়া করতাম। মাঝেমধ্যে দেখতাম চতুর্থ বাটিটাও দেয়া হয়েছে। ভাবতাম, ভালো-মন্দ বাড়তি কিছু রান্না হয়েছে বুঝি! কিন্তু খটকা লাগল একজনের কথায়।

-কি রে, বাটির ওজন আগে যেমন ছিল এখনো তেমন। তাহলে চতুর্থ বাটিতে কী গো? নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। নইলে হঠাৎ হঠাৎ কেন এটার আমদানি হবে?

***

একদিন হুজুরের খুবই মন খারাপ। রাতেও বাসায় যাননি। সকাল থেকে মনমরা ভাব নিয়ে সবক শুনলেন। সাতসবক শুনলেন। ঘুমের ছুটি হলো। একজন বলল, আমি তোদের একটা ম্যাজিক দেখাতে পারি।

-কী ম্যাজিক?

-আজ দুপুরে টিফিন ক্যারিয়ারে বাটি আসবে চারটা।

-ধুৎ! তুই বললেই হলো! চার বাটি কবে এনেছি মনেও পড়ে না। হঠাৎ করে চারটা কেন হবে?

-বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে অপেক্ষা কর!

আমরা উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছি। কী হয় কী হয়! আসলেই তো! আজ বাটি এসেছে চারটা?

-আশ্চর্য তো, তুই কিভাবে বুঝলি আজ বাটি চারটা আসবে?

-জানি রে জানি, হুজুরের কাছে পড়ি আর হুজুর সম্পর্কে জানব না!

-কীভাবে জেনেছিস বল না!

-আজ সকাল থেকে দেখেছিস হুজুরের মন খারাপ?

-হুঁ! তো...?

-যখন মন খারাপ থাকে, তখনই বাড়ি থেকে চারটা বাটি আসে।

-মন খারাপের সঙ্গে চতুর্থ বাটির কী সম্পর্ক?

-আছে আছে! হুজুর আজ আসরের পর বাড়ি যাবেন দেখিস। আগেই বলে দিলাম।

-তুই দেখি কুরআন হেফজ করতে এসে হুজুরকে হেফজ করে বসে আছিস!

-ওস্তাদকে না বুঝলে ইলম আসবে! যে শিষ্য তার ওস্তাদকেই বুঝতে পারল না, বুঝতে চেষ্টা করল না, সে বড় দুর্ভাগা!

-ওরে, আমার সৌভাগ্যবান রে!

হুজুর ঠিকঠিক আসর পড়ে আর হেফজখানার দিকে এলেন না। সোজা বাড়ি চলে গেলেন। মাগরিবের আগে হাসিহাসি মুখে ফিরে এলেন। দুষ্টটার কথা সব ফলে গেল। তার কথা ঠিক থাকলে, হুজুর আজ রাতে বাসায় যাবেন। রাতে পুকুরপাড়েও বসতে পারেন। আমরা তাকে কষে চেপে ধরলাম। পেটপুরে নাস্তা খাওয়ানোর লোভ দেখালাম।

-একটু বল না, তুই এতসব আগে থেকে কিভাবে বলে দিলি?

-শোন, আমি খেয়াল করে দেখেছি, আমাদের হুজুর মাঝে মধ্যে মনমরা হয়ে থাকেন। তখন বাড়িতে যান না। আর যখনই আম্মাজির প্রতি কোনো কারণে হুজুর রাগ করেন, সারাক্ষণ মন খারাপ করে বসে থাকেন। একটুও স্বস্তি পান না। হয়তো হুজুর নিজেই রাগের কারণ। আম্মাজিকে যেমন মানুষ হিশেবে জানি, স্বামী কষ্ট পাবেন এমন কিছুই তিনি করবেন না। করতে পারেন না। হুজুর নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকেন। চাপা স্বভাবের কারণে আগ বেড়ে ক্ষমা চাইতে যেতে পারেন না। অক্ষম কষ্টে জ্বলতে থাকেন। আম্মাজি অত্যন্ত দূরদর্শী। তিনি স্বামীর মন খারাপের ব্যাপারটা বিলক্ষণ ধরতে পারেন। তিনিই আগ বেড়ে ঘাট মানেন। আপোষরফা করেন। সেদিন চারটা বাটি আসে। চতুর্থ বাটিতে থাকে একটা চিঠি।

-তুই চিঠির কথা কিভাবে জানলি?

-সেটা তোদের জেনে কী লাভ শুনি? চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই হুজুর উতলা হয়ে ওঠেন বাসায় যাওয়ার জন্যে। সংকোচের কারণে আমাদের আমুখতা শোনা বাকি রেখে যেতে পারেন না। আমরা কী মনে করি? তাই আসর পড়ে আর দেরি করেন না। আরও খেয়াল করলে দেখবি, ফেরার পর হুজুরের কোনো একটা পরিধেয়ও বদলে যায়। আগের লুঙ্গিটা পরনে থাকে না।

-তুই তলে তলে এতটা পেকেছিস আগে বুঝিনি। এতটুকু যখন বললি, বাকিটুকুও আর থাকে কেন? চিঠিতে কী লেখা থাকে রে?

-আমি একবারের কথা বলতে পারব।

-কী ছিল লেখা?

-বড় বড় করে সুন্দর অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা ছিল,

I Love You

আ-শিরু বিল মা'রূফ

কত কত অদ্ভুত কারণেই বিয়ে ভাঙে! পাশ্চাত্যে তো শুনেছি স্বামীর বা স্ত্রীর নাকডাকার কারণেও তালাকের মামলা ঠোকাঠুকি চলে! এ তো বিয়ের পরের কথা, বিয়ের আগে সবকিছু ঠিকঠাক হওয়ার পরও অনেক সময় ছোট্ট কোনো কারণে বিয়ে ভেঙে যেতে পারে।

***

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একটা পরিবারের ঘটনা। দু পরিবারের যাবতীয় কথাবার্তা চূড়ান্ত। বাকি শুধু ছেলে একবার মেয়ে দেখবে। ঘরোয়াভাবে আগেই দেখা হয়ে গেছে। ছেলের হুঁ বলাটা বাকি! কোনো এক উপলক্ষে, ছেলের সঙ্গে তার হবু শ্বশুর ও শালার দেখা হয়ে গেল। শহরের এক মসজিদে। ছেলে এগিয়ে গিয়ে শ্বশুরকে সালাম দিল, কুশল বিনিময় করল।

ঠিক রাতের বেলায় পাত্রপক্ষের বাড়িতে ফোন গেল,

-বিশেষ কারণবশত এ বিয়ে সম্ভব নয়। আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত! আমরা ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব।

পাত্রপক্ষের মাথায় হাত! তারা অনেক চেষ্টা করল কারণ জানতে। কিছুতেই সম্ভব হলো না। শেষে হাল ছেড়ে দিল।

পরে মেয়েটার আরও অনেকগুণ ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলো। নতুন পাত্রটা বলতে গেলে আমাদের একেবারে একপাতের মানুষ। তাকে দিয়ে তার শ্বশুর বাড়ির খবরটা উদ্ধার করার চেষ্টা করলাম,

-আগের বিয়েটা নিশ্চয়ই পাত্রপক্ষের কোনো অসংগতির কারণে ভেঙেছে! সেই সূক্ষ্ম কারণটা কী?

নতুন জামাই কয়েকদিন পর জানাল,

-আমার শ্বশুরের সঙ্গে আগের ছেলেটার দেখা হয়েছিল। সঙ্গে আমার শ্যালকও ছিল। তার দিকে 'পাত্র'টা ফিরেও তাকায়নি। কথাও তো দূরের কথা! বিষয়টা শ্বশুরের কাছে ভীষণ দৃষ্টিকটু লেগেছে। যদিও এটা কোনো বড় বিষয় নয়। তবুও শ্বশুরের মনে হলো, ছেলের মধ্যে ভদ্রতাবোধ ও

সৌজন্যবোধের কমতি আছে! তার সঙ্গে আমার মেয়ে সুখী হতে পারবে না। জামাই হয়তো ছোটখাটো বিষয় নিয়ে খিটিমিটি করবে!

শ্বশুরের অনুমান একশ ভাগ ঠিক ছিল। সে পাত্রের খবর আমরা জানতাম। বেশ যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও, তার মধ্যে কিছু বিষয় ছিল যা আমাদের সঙ্গে ঠিক মানাত না।

***

উন্নত দেশে বিয়ে ভাঙার আরেকটা কারণ, স্বামীর অপরিচ্ছন্নতা। উল্টোটাও হয়। এক পরিচিত পরিবারেই ঘটেছে। স্ত্রী খুবই অপরিচ্ছন্ন থাকত। ঘরবাড়ির কথা না হয় বাদই দিলাম। নিজে একটু পরিচ্ছন্ন থাকবে, সেদিকেও মন নেই। অনেক চেষ্টার পরও না শোধরানোয়, ছেলে বাধ্য হয়ে বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল। পরে বিয়েটা ভেঙে যায়।

***

এক লোক নবীজির দরবারে এল। চুলগুলো উস্কু খুস্কু! তিনি বললেন, 'মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলো। এতে তোমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।'

***

ইবনে আব্বাস রা. বলতেন, 'আমি সুন্দর পোশাক পরি। সাজগোজ করি। কারণ, আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।'

***

নবীজি পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে আতরের সুবাস ছড়িয়ে পড়ত। সুবাস শুঁকেই সবাই বলে দিত নবীজি গিয়েছেন বা এসেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা যখন তোমাদের ভাইদের কাছে আসা-যাওয়া করো তখন তোমাদের বাহন ও পোশাক-আশাক পরিপাটি করে নেবে। যাতে মানুষের মধ্যে তোমাদের একটা প্রভাব (সুবাস) থাকে। কেননা, আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতা ও অসৌজন্য পছন্দ করেন না।' (*আহমাদ*)

***

এক মহিলা এসে উমর রা.-এর কাছে নালিশ করল,

-তার সঙ্গে আমার বনিবনা হচ্ছে না। আমাকে তার কবল থেকে মুক্ত করে দিন।

উমর রা. মহিলাকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। স্বামীকে ডাকালেন। দেখেই বুঝতে পারলেন, স্ত্রী কেন বিচ্ছেদ চাইছে! মানুষটার চুল উস্কুখুস্কু!

পরিধেয় পোশাক অপরিচ্ছন্ন। গোসল করেছে অনেক দিন হয়েছে। গা থেকে বদগন্ধ বেরুচ্ছে। পাশের একজনকে বললেন, একে নিয়ে যাও। চুল কাটিয়ে, ভালো করে গোসল করিয়ে আনো। ভালো এক জোড়া পোশাকও পরিয়ে দেবে।

তারপর মহিলাকে ডেকে পাঠালেন। স্বামীকে বলে দিয়েছিলেন, স্ত্রীর হাত ধরতে। স্ত্রী স্বামীকে প্রথমে চিনতেই পারেনি। বলে উঠল, তুমি আমীরুল মুমিনীনের সামনে এমন করছ!

পরে চেহারার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিনতে পারল। অভিব্যক্তি বদলে গেল তার। উমর রা. বললেন,

-বউকে নিয়ে বাড়ি যাও। সবসময় স্ত্রীর সঙ্গে এমনি করবে। কারণ, তারাও চায় তোমরা তাদের জন্যে পরিপাটি হয়ে থাকো। যেমনটা তোমরা চাও স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে সুন্দর-সজ্জিত হয়ে থাকুক।

***

হযরত হাসান রা.-এর একটা বিখ্যাত উক্তি আছে,

-পুরুষের উপযুক্ত পোশাকাশাক ও অভিব্যক্তি তার স্ত্রীর পূতপবিত্রতাকে বাড়িয়ে দেয়।

স্ত্রী যদি তার স্বামীকে সুন্দর-সুঠাম দেখে, স্বামীর মধ্যে রুচিশীলতা দেখে, তার পরিপাটি বেশভূষা দেখে, তার মধ্যে পরপুরুষের দিকে মনোযোগ যাওয়ার সুযোগই থাকবে না। ভিন্ন চিন্তার অবকাশই পাবে না।

***

আলী তানতাবী আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

আমি তখন আলবেঙ্ক শহরের বিচারক। এক যুবতী এল। বিচার নিয়ে। দেখতে শুনতে বেশ। মার্জিত। নম্র। অভিজাত। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না। সরাসরি বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করল। আমি সময় নিলাম। স্বামীকে ডাকালাম। তাকে দেখে অবাক। সুন্দর এক যুবক। কাছে ডেকে বসালাম। কারণটা অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম, স্ত্রী এই সুন্দর যুবককে ছাড়তে চাইছে কেন? একটু পরেই বিষয়টা পরিষ্কার হলো। যুবকের গা থেকে একধরনের কটু বদগন্ধ বেরুচ্ছিল।

-তুমি কী করো?

-একটা গোশত সরবরাহ কোম্পানিতে চাকরি করি।

-তোমার কাজ কী?

-গরু জবাই তদারক করা। গোশত বানিয়ে প্যাকেট করার দিকটা দেখা।

-তুমি কি এখন সরাসরি ওখান থেকেই এসেছ!

-জি।

-প্রতিদিন এভাবেই ঘরে ফিরো?

-জি।

-ঘরে ফেরার আগে বা পরে পোশাক পাল্টাও না?

-না, প্রয়োজন পড়ে না। পরিষ্কারই তো থাকে!

-আজ তুমি এক কাজ কোরো। বাড়ি যাওয়ার আগে সুন্দর করে চুল কাটবে! কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে গোসল করে, এক জোড়া পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে তবে ঘরে ফিরবে! আর আগামীকাল বউকে নিয়ে সকাল সকাল কোর্টে চলে আসবে!

পরদিন ওরা দুজন এল। আমি দূর থেকেই দুজনকে লক্ষ করছিলাম। ওদের ডাক পড়ল,

-তুমি কি গতকালের দাবির ওপর আজও অটল আছ?

-জি না। আমি ওর সঙ্গেই থাকব!

***

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়ম অনুযায়ী। বাকারা (০২:২২৮)

সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

-আশিরুহুন্না...

তোমরা তাদের সঙ্গে সুন্দর-সদ্ভাবের সঙ্গে জীবনযাপন করো। (০৪:১৯)

স্ত্রীর বিকল্প

আকস্মিক রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল স্ত্রী। স্বামীর মাথায় হাত দেয়া ছাড়া উপায় রইল না। ছোট ছোট দুটি শিশু! একটি আবার দুগ্ধপোষ্য! তাকে সবসময় চাকরির মায়ায় এ-শহর ও-শহর ঘুরে বেড়াতে হয়। স্ত্রী তো দূরের কথা, সন্তানদের দিকেও ফিরে তাকানোর ফুরসত মেলে না। স্ত্রী অনেক করে বলেছে,

-এবার টাকার পেছনে ছোটা বন্ধ করো। আমাদের বেশি কিছু লাগবে না। মোটামুটি খেতে পরতে পারলেই হবে। কী হবে অত টাকা দিয়ে, স্বামীকেই যদি কাছে না পেলাম!

-এখন একথা বলছ। টানাটানি পড়লে, ঠিকই আসল রূপে জাহির হবে! ঘরে থাক, আরামেই তো আছো! তোমার অত কাজ কী! তিনটা ছেলেপিলে মানুষ করা। আর আমাকে কত কত কাজ করতে হয়! সে কষ্ট যদি বুঝতে!

***

কাজের ধকল আর অসুস্থতার প্রকোপ দুয়ের চাপ সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীর অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছিল। স্বামী বেচারা তখনো হিল্লিদিল্লি করে বেড়াচ্ছে! তার ধারণা ঘরের বউয়েরা বেশ আরামেই থাকে। খায়-দায়-ঘুমায়। এদিকে তার ঘরের মানুষটা তিনটা সন্তানের আদর-আবদার মেটাতে মেটাতে মৃত্যুর দুয়ারে। স্বামীর অবহেলা, ডাক্তার-পথ্যের অভাবে বেচারি মারা গেল।

স্বামী তখন বিজনেস ট্যুরে! খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ফিরে এল। দিশেহারা অবস্থা। নিকটাত্মীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার সন্তানদের দায়িত্ব নেবে। বউ মারা গেছে, ক'দিন হলো। বন্ধু-বান্ধবরা পরামর্শ দিল আরেকটা বিয়ে করে ফেলতে; কিন্তু মনে সায় দিল না। চক্ষুলজ্জার কারণেই হোক বা অন্য কিছু! ঠিক করল, একজন অভিজ্ঞ বয়স্ক সার্বক্ষণিক আয়া রেখে দেবে।

***

বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলো পত্রিকায়। আবেদনপত্র জমা পড়ল অনেক। অনেক ঝাড়াই-বাছাই করে একজনকে সাক্ষাৎকারের জন্যে ডাকা হলো।

-আপনি বিজ্ঞপ্তি পড়ে নিশ্চয় বিস্তারিত জেনেছেন।

-জি, জেনেছি; কিন্তু আপনারা বিজ্ঞপ্তিতে তো বিস্তারিত কিছুই বলেননি।

-কেমন?

-শুধু বলেছেন, তিনটা বাচ্চা দেখেশুনে রাখতে হবে। আর ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

-হু! ঠিক আছে তো।

-কিন্তু মাসোহারার পরিমাণ তো উল্লেখ করা নেই। কাজের ধরনের কথাও খুলে বলা হয়নি।

-আমরা এখন মুখোমুখি সেটা ভেঙে নিতে পারি! আমরা ঠিক করেছি, মাসে পনেরোশ জুনাইহ করে দেব।

-তিনটা ছেলে, তার মধ্যে একজন দুগ্ধপোষ্য! পনেরোশ জুনাইহ খুবই কম হয়ে যায়।

-আপনি কত হলে পারবেন?

-কমপক্ষে ২০০০ জুনাই দিতে হবে!

-আমরা বিষয়টা বিবেচনাধীন রাখতে চাই। কাজ দেখার পর আমরা সেটা ঠিক করব। তা হলে এ কথাই রইল। আপনি কবে থেকে যোগ দিতে পারবেন?

-উঁহুঁ! কথা এখনো শেষ হয়নি। আমি এ টাকায় শুধু বাচ্চাদের খাওয়া-নাওয়া-ঘুম ইত্যাদি দেখব! তাদের পড়াতে হলে, বাড়তি তিনশ জুনাই দিতে হবে! আর যদি বাচ্চাদের জন্যে রান্না-বান্নাও করতে হয়, বাড়তি আরও চারশ জুনাই দিতে হবে। শর্ত থাকবে, বাজার-সদাই ও যাবতীয় দ্রব্য বাজার থেকে এনে দিতে হবে। আর বাচ্চাদের জামা-কাপড় আমাকেই ধুতে হলে আরও দু শ জুনাই অতিরিক্ত দিতে হবে।

-বাব্বাহ! আপনাকে রাখতে হলে দেখছি রীতিমতো ব্যাংক খুলে বসতে হবে।

-আমার কথা শেষ হয়নি! আপনার কোনো ছেলে যদি অসুস্থ হয় তখন বাড়তি সেবা-যত্নের প্রয়োজন পড়বে। সেটা কে করবে? আমাকেই যদি করতে হয়, আরও ৩০০ জুনাইহ দিতে হবে। আর আমি ঘরদোর পরিষ্কার করতে পারব না। আপনার ব্যক্তিগত কাজও আমাকে দিয়ে হবে না। সেজন্য আলাদা পরিচারিকা রাখতে হবে। প্রতি সপ্তাহে একদিন আমি ছুটি

কাটাব। এটা আমার প্রাপ্য অধিকার। ছুটির দিনে আমার সঙ্গে ফোনেও যোগাযোগ করা যাবে না। বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দিলে, আমি ছাড়া কোনোভাবেই সমাধান হচ্ছে না, তাহলে যোগাযোগ করা যাবে। সেজন্য অবশ্য আলাদা ফি দিতে হবে।

এত লম্বা ফর্দ শুনতে শুনতে স্বামী বেচারার চোখ কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম!

যাহ, দুষ্ট!

টানা-হ্যাঁচড়ার শেষ নেই। এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে নিয়মিত তোপ দাগিয়ে যাচ্ছে। আশআরী-মাতুরিদীরা বলে আল্লাহ কেবল আরশে বা আকাশেই আছেন, এমন নয়। সালাফী চিন্তাবিদরা বলেন আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন আছেন। তবে এর সঠিক রূপ কেউ জানে না।

এ নিয়ে মল্লযুদ্ধ কেতাবেই সীমাবদ্ধ নেই! রীতিমতো ফেসবুক ছাড়িয়ে বিয়ে পর্যন্তও গড়ায়। মাঝেমধ্যে বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ে,

-সহীহ আকীদার পাত্রী চাই।

কেউ কেউ নিজের ওয়ালে ঘোষণা দেয়,

-আসুন না, আমরা যারা ফেসবুকে সহীহ আকীদার আছি, একদিন সবাই মিলে চা খাওয়া যাক।

পাল্টা বিজ্ঞপ্তিও চোখে পড়ে,

-পাত্রী তাবলীগি পরিবারের হলে ভালো। অথবা 'অমুক' পীরের মুরীদ হলে প্রাধান্য পা!বে।

***

দুজনে সেই ছেলেবেলা থেকে বন্ধু। পড়াশোনার পাট চুকার পর যে যার পথ ধরল। একজন সরকারি চাকরিতে, আরেক বন্ধু বউ-বাচ্চাসহ সৌদি। যৌবনের স্বপ্নমুখর দিনে, দুবন্ধু প্রতিজ্ঞা করেছিল, দুজনের সম্পর্কটাকে পোক্ত রূপ দিতে হবে। আল্লাহর কী মহিমা! দেশে থাকা বন্ধুর প্রথম সন্তান হলো ছেলে। প্রবাসী বন্ধু জীবিকার তাড়নায় সময়মতো বিয়ে করতে পারল

না, দেরি হয়ে গেল। দেশি বন্ধুর পাঁচ বছর পর বিদেশি বন্ধু বাসর করতে পারল। দু-বছরের মাথায় এল একটা ফুটফুটে কন্যা।

সপরিবারে প্রবাসে থাকার কারণে মেয়েটাও ওখানকার স্কুলেই পড়াশোনা করল। বাংলা মিডিয়াম থাকলেও বাবার ইচ্ছায় মেয়ে ইংরেজি ও আরবী মিডিয়ামে পড়াশোনা করল।

দু-বন্ধু দুই দেশে থাকলেও, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি কখনো। নিয়মিত সালাম-হ্যালো চলত। তবে বিয়ের ব্যাপারটা দুজনের বাইরে কেউ জানত না। এমনকি দুই বিবিও না। সময় গড়াতে গড়াতে এদিকে ছেলে লায়েক হয়ে উঠল। ওদিকে মেয়েও সোমত্ত হলো। বন্ধু দুজন ঠিক করল সামনের ঈদে শুভকাজ সমাধা করতে হবে। দেশি বেয়াই লায়েক ছেলেকে নিয়ে বিমানবন্দরে গেলেন। উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই মৌমাছি আর ফুলকে কাছাকাছি করে দেয়া।

উভয় পক্ষের মুরুব্বিদের কথাবার্তা শেষ। এবার পাত্র-পাত্রীর পালা। কানভাঙানি আসতেও দেরি হলো না। একজন এসে পাত্রপক্ষের কানে কানে বলে গেল,

-পাত্রী এই বিয়েতে রাজি নয়।

-কেন? কেন?

-ছেলে বেদাতী আকীদা পোষণ করে।

ছেলের বাবা কথাটা বাড়তে দিলেন না। বন্ধু যেহেতু কিছু বলেনি, তাহলে ধরে নেয়া যায় সমস্যাটা বড় কিছু নয়। ওদিকের ঘটনাও প্রায় এক! কেউ একজন কান ভাঙানি দিল,

-ছেলে এই বিয়েতে রাজি নয়।

-কেন?

-মেয়ে আহলে হাদীস।

মেয়ের বাবাও বিষয়টা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করলেন না। ঠিক হলো, ঈদের পরদিন পাত্র আসবে। দুজনে একে অপরকে পছন্দ করলে সাথে সাথেই আকদ হয়ে যাবে!

যথাসময়ে ছেলে উপস্থিত! মেয়ে এল ছোটভাইকে সঙ্গে নিয়ে। ছেলে আগে কথা বলবে কি, লজ্জায় মরেই যাচ্ছিল! আবার আড়চোখে না তাকিয়েও পারছিল না। এত্ত সুন্দরও মানুষ হতে পারে? তার মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে গেল, সুবহানাল্লাহ!

মেয়ে সচকিত হয়ে চোখ তুলল! চারি চোখে মিলন! ছেলে চোরা চোখে তাকাতে গিয়ে ধরা পড়ে খুক করে কেশে উঠল! মেয়ের অবাক করা প্রশ্ন,

-সুবহানাল্লাহ কেন বললেন?

-বলব না, না বলে উপায় আছে!

মেয়ে মনে মনে বেজায় খুশি! সে শুনেছিল ছেলেটা নিতান্ত গোবেচারা টাইপের হুজুর! এখন দেখি তা নয়। বেশ সেয়ানাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আকীদার প্রশ্নে আপোষ করা যাবে না। যেভাবেই হোক, আমার যা জানার তা জানতেই হবে! বেদাতী আকীদার কারও সঙ্গে জীবন কাটাতে চাই না!

যাক একথা-ওকথা করে করে এগুতে লাগল। ছেলে একপর্যায়ে বলল,

-আমার আসলে কিছুই জানার ছিল না। আর আপনাকে অপছন্দ করার কোনো কারণ থাকতেই পারে না!

-আমার কয়েকটা প্রশ্ন ছিল!

ছেলে ভয় পেয়ে গেল মনে মনে। এই সেরেছে, ঝামেলায় ফেলবে না তো! তারপরও মনের কথা মনে চেপে বলল,

-অবশ্যই! বলুন কী জানতে চান?

-কিছু মনে করবেন না। আমি শুধু দুটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।

-কোন বিষয়ে?

-আল্লাহ সম্পর্কে!

ছেলে সশব্দে আঁতকে উঠল। ইশশিরে! শেষ রক্ষা হলো না রে! এই হুরীকে বুঝি হারালাম! ইয়া আল্লাহ, ইয়া মাবুদ, আপনি যেখানেই থাকুন! আপনি আমার রব! আর কেউ নয়। এই গরিবের দিকে একটু রহমতের দৃষ্টি দিন!

-জি প্রশ্নটা বলুন। তবে আমার একটা শর্ত আছে।

-কী শর্ত?

-আপনি শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন। বাকিটা প্রথম প্রশ্নের উত্তর থেকে অনুমান করে নেবেন!

মেয়ে কমলার কোয়ার মতো অধর কামড়ে ধরে একটু ভেবে বলল,

-আচ্ছা ঠিক আছে, বলুন তো আল্লাহ তা'আলা কোথায় আছেন?

ছেলে মনে মনে বলল,

বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান
এইবার তোমার আমি বধিব পরাণ।

যা ভেবেছি সেটাই প্রশ্ন করল। চোখ বন্ধ করে আল্লাহর মা'রেফতে ডুবে গেল। কোথায় আছেন তিনি? কোথায় আছেন তিনি? নিজের সত্যিকার আকীদা বলতে গেলে এমন হুরেঈনকে হয়তো হারাতে হবে। আবার নিজের আকীদা পাশ কাটিয়ে অন্য কিছু বললে, ভেতরে এক বাইরে আরেক হয়ে যাবে। এমন একটা উত্তর দিতে হবে, যাতে সালাফী-মাতুরিদী-আশ'আরী সব আকীদাই বোঝা যাওয়ার অবকাশ থাকে। ভাবতে ভাবতে বিদ্যুৎ-চমকের মতো *মুসলিম শরীফের* একটা দরসের কথা মনের পর্দায় ভেসে উঠল! সাথে সাথে বলল,

-এসব তো জটিল বিষয়! নিজের ভাষায় বলতে গেলে ভুল হয়ে যেতে পারে! আমি হাদীস দিয়ে উত্তর দিই?

-ওম্মা, তা হলে তো কথাই নেই!

ছেলে এবার দাওরা হাদীসে ইবারত পড়ার মতো সুর করে দুলে দুলে পড়তে শুরু করল,

ওয়া বিহি কালা হাদ্দাসানা

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ. إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ! কোনো মহিলাকে তার স্বামী বিছানায় আহ্বান করল, কিন্তু মহিলা তাতে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানাল, তা হলে আসমানে যিনি আছেন, তিনি মহিলার প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হবেন। স্বামী সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত তিনি তার প্রতি রাজি হবেন না।

ছেলের তখনো চোখ বন্ধ। সে অবস্থাতেই বলল, এটা সহীহ হাদীস। আলবানী রহ.-এর সার্টিফিকেটের দরকার নেই। *মুসলিম শরীফে* আছে। একথা বলে ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল! দেখল সামনে বসা হুরপরীটা কীভাবে যেন আরও সুন্দর হয়ে গেছে! চেহারায় খেলা করছে আনন্দ আর রাজ্যের লজ্জা। সম্মতি! সংকোচ! অনুরাগ! আগ্রহ! কৌতূহল! বিস্ময়! আরও কত কী! চোখাচোখি হতেই পরীটা 'যাহ দুষ্ট' বলে মুখে ওড়না চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে পালাল।

চড়ুইদম্পতি

একটা দরস (ক্লাস) শেষ করেই হুজুরকে দেখতাম টুক করে ঘরে চলে গেছেন। ছেলেরা কিছু না বলে মুখ টিপে হাসছে। নতুন গিয়েছি, এখনো মাদরাসার হাল-হাকীকত ভাল করে বোঝা হয়নি। হুজুরের চুলে পাক ধরেছে; কিন্তু মনে পাক ধরেনি। মাদরাসার পেছনে বড় এক পুকুর। তার পাড়ে বিশাল বাঁশঝাড়! ওটা পেরিয়ে গেলেই হুজুরের বাড়ি! আমরা ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতাম, হুজুর কী ভীষণ আগ্রহ নিয়ে ঘরের পানে ছুটছেন! হুজুরকে আসতে দেখে, বুড়িমাও দরজা খুলে এগিয়ে আসতেন। দূর থেকে আবছা দেখা যেত। বুড়িমা পুকুরপাড় ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে আসতেন! তারপর দুজনে একসঙ্গে ঘর পর্যন্ত যেতেন। কখনো হাত ধরাধরি করে! কখনো দেখা হওয়ার স্থানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলতেন। এত কথা কোথায় যে পেতেন! মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে হুজুর ঘর থেকে এসেছেন আমাদের পড়াতে। এই খানিকের মধ্যেই এত কথা জমে গেছে! এত ভাব, এত আবেগ! এই বুড়ো হাড়েও? আমাদের কচি মনে বেশ দোলা দিয়ে যেত দুজনের নিষ্পাপ ভালবাসার দৃশ্যগুলো। এই বুড়ো বয়সেও দুজনের খুনসুটিগুলো বেশ লাগত! তখন হয়তো এগুলোকে সঠিক অর্থে বুঝতাম না। কিন্তু দুজন মানুষের একে অপরের প্রতি গভীর অনুরাগ, আশপাশকে আপ্লুত করে ফেলত!

***

আমাদের বুড়ো হুজুর গল্প শোনাতেন। আমরা হুজুরের বাড়িতে ধান কাটতে যেতাম। পুকুরের মাটি কাটতে যেতাম! বৃহস্পতিবার যোহরের পর ছুটি হলে মাদরাসায় থেকে যেতাম। কাছেই তো! একটু জিরিয়ে সোজা ক্ষেতে চলে যেতাম। শুরু হত ধান দা-নো (কাটা)। ফাঁকে ফাঁকে পানচিনি চলত। বুড়িমা পাঠাতেন। অন্য হুজুরদের বাড়িতে কাজ করতে গেলে ঘণ্টায় যদি একবার নাস্তা আসতো, বুড়িমার কাছ থেকে আসত দুবার। অন্যদিন পান খাওয়া নিষিদ্ধ থাকলেও, কাজ করতে এলে সিদ্ধ হয়ে যেত।

বাড়ি থেকে আস্ত পানের বাটাই পাঠিয়ে দিতেন। বুড়ো হুজুর আমাদেরকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ থেকে আবার চলে যেতেন। আবার সেই ঠোঁটটেপা হাসি! রুদ্ধদ্বার ভালোবাসা।

***

এখন হুজুর আর বুড়িমার মধ্যে কুসুম কুসুম ভালোবাসা চুইয়ে চুইয়ে পড়লেও, একটা সময় ছিল ঢিসুম ঢিসুম! বুড়িমার জামাই পছন্দ হয়নি। কেন যে হয়নি সে এক রহস্য। অথচ বিয়ের আগে তিনিই এখানে সম্বন্ধ পাতাতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। হুজুর গরীব জেনেই বিয়েতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনার শুরু আরও বহু আগে। বুড়িমার কাছে তাদের জীবনের গল্প শুনেছি। বহুবার! হুজুরের কাছ থেকে শোনা গল্পটাই তুলে ধরা যাক।

-আমার আব্বু ছিলেন অত্যন্ত কড়া ধাঁচের মানুষ। পান থেকে চুন খসতে পারত না। কড়া শাসনে রাখতেন আমাদের। আদরও করতেন বেশুমার। অন্যায় করলে পেটাতেনও বেদম! আব্বুর একটা সাইকেল ছিল। স্কুলে যাওয়া-আসা করতেন। স্কুল ছিল অনেক দূরে। সাত সকালে চারটা খেয়ে দুই চাকায় চড়ে বসতেন। ফিরতে ফিরতে সেই রাত!

আমার বেজায় শখ ছিল সাইকেল চালানোর। কিন্তু সুযোগ কই! একমাত্র রাতেই সাইকেল ঘরে থাকে। এক বৃহস্পতিবারে, চাচাত ভাইসহ সাইকেলটা বের করে আনলাম! আমি কোনোরকমে চড়ে বসলাম! সে পেছন থেকে ধরে রাখছে। মনের আনন্দে প্যাডেল ঘোরাচ্ছি! সে ধাক্কা দিয়ে গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে! সমস্যা দেখা দিল থামানো নিয়ে! ব্রেক কষলে উল্টে পড়ার সম্ভাবনা। লাফ দিয়ে নামব সে উপায়ও নেই। সামনেই বাড়ির পুকুর! এতকিছু ভাবার সময় পাওয়া গেল না। ঝপাৎ করে পুকুরে গিয়ে পড়লাম! হাবুডুবু খেতে খেতে হাঁচড়ে পাঁচড়ে তীরে ভিড়লাম। কিন্তু সাইকেল? ডুব দিয়ে চেষ্টা করলাম! পেলাম না। গভীর রাত, পুকুরের দিকে তাকাতেই ভয়ে গা সিঁটিয়ে ওঠে! সাহস করে নেমে পড়েছিলাম! ঝোঁকের বশে নামলেও ভয়ের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আর নামতে হিম্মত হলো না। এখন উপায়? আব্বু সকালে উঠে বাজারে যাবেন! সাইকেল না পেলে বুঝে ফেলবেন সব! ভয়ের চোটে হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যাওয়ার যোগাড়! কী যে করি! এখন দুপুররাত! আম্মু জেগে থাকলে যা হোক একটা বন্দোবস্ত করা যেত! চাচাত ভাই সাঈদকে বললাম,

-সাঈদ, আমি আজ বাড়িতে যাব না। তুই গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। সকালে চুপি চুপি আম্মুকে বলবি, সাইকেল কোথায় ডুবেছে।

-আপনি এতরাতে কোথায় যাবেন?

-আপাতত কাছারি ঘরে ঘুমিয়ে থাকব। সকালে দূর থেকে লক্ষ্য রাখব। আব্বুর মতিগতি সুবিধের না ঠেকলে, কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা দেব।

আব্বু ফজর পড়ে এসে সাইকেল না পেয়েই যা বোঝার বুঝে গেলেন। হাঁকডাক করতে করতে বাজারের থলে নিয়ে হাটের দিকে রওয়ানা দিলেন। বুঝতে বাকি রইল না, সামনে পেলে আমাকে আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন। মানে মানে সরে পড়াই নিরাপদ।

আম্মুকে লুকিয়ে ঘরে এলাম। হাতড়ে হাতড়ে লুঙ্গি-জামা নিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে এলাম। হাটের রাস্তা এড়িয়ে পূবমুখী কোণাকুণি আইলের পথ ধরলাম! গন্তব্য নিরুদ্দেশ! হুট করে বেরিয়ে পড়া। মাথায় এল চরের দিকে চলে গেলে কেমন হয়! এক বন্ধুর বাড়ি ওদিকে। ধানকাটার মৌসুম চলছে। অনেক খুঁজেও বন্ধুর বাড়ি বের করতে পারলাম না। রাতে ধান কাটতে আসা একদল কামলার ঝুপড়িতে আশ্রয় নিলাম। তাদেরকে সব কথা বললাম না। শুধু বললাম, আমার বাড়িঘরে ঠাঁই নেই! আপাতত কোনো আশ্রয় নেই! তারা দয়াপরবশ হয়ে থাকতে দিল। খেতে দিল। সকালে তাদের সঙ্গে ক্ষেতেও নিয়ে গেল। আমি বেশ ভাল ধান কাটতে পারতাম। ছোটবেলা থেকেই কাজ করে আসছি! তারা হল মৌসুমি কামলা। আমরা গ্রামের মানুষজন স্থায়ী কামলা! আমার ধান কাটা দেখে তো তারা অবাক! জমির মালিকও মুগ্ধ! কিছু বললেন না। দিনশেষে আমার জন্যে মজুরির ব্যবস্থা হল। অবশ্য কামলারা ধান কাটে ঠিকা হিশেবে। গেরস্থের সব জমির ধান কেটে দিলে এত এত টাকা পাওয়া যাবে। থাকা-খাওয়া মালিকের।

টিকে গেলাম দিনমজুর হয়ে। ততদিনে আমার থাকার ব্যবস্থা কামলাদের ঝুপড়ি থেকে গেরস্থের কাছারি ঘরে স্থানান্তরিত হয়েছে। বাড়ির জন্য মন কেমন করলেও পিটুনির ভয়ে যেতে মন সরছিল না। এখানে থাকতে থাকতে পরিবেশ পছন্দ হয়ে গেল। লেখাপড়া নেই। প্রথম দিকে বেশ ভালোই লাগছিল। চারদিকে ধু ধু চর! দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ! মহিষ চরছে, গরু চরছে। মাইলের পর মাইল খোলা আকাশ! এক নেশা ধরানো প্রকৃতি! তখনো মুহুরি প্রজেক্ট কারো কল্পনাতেও ছিল না। সাগর ছিল উদ্দাম, উন্মুখ, উন্মাতাল!

এখন তো মুহুরি প্রজেক্টের কারণে পানি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছে। সেই ষাটের দশকে, উত্তাল পানির সে কি তোড়জোড়! পানি নেমে গেলে গোটা চরাঞ্চল কী সবুজ হয়ে উঠত! শুধু মাটি? মানুষের মনও যে তখন সবজে রঙ ধারণ করত! মুহুরি পাড়ের বিকেলগুলো এখনো যে তীব্রভাবে টেনে ধরে রাখে, তখন কেমন ছিল কল্পনাও করা যাবে না। বিশেষ করে গোধূলি বেলার মন কেমন করা গা-জুড়ানো বাতাসে সে এক নাড়িছেঁড়া টান! উঠে আসতে ইচ্ছাই করে না। মনে হয় বসেই থাকি, বসেই থাকি! অনন্তকাল! রাত-দিন!

আমার মনিবের বাড়ি ছিল বর্তমান প্রজেক্টের অদূরে। ধানকাটার জমিও এর আশপাশেই। কামলারা দিনে কাজ করত, রাতে করুণ সুরে গীত গাইত। একা একা, কোরাস করে করে!

হেইয়ারে মাঝি ভাই!
কইও আমার মায়ের ঠাই!
মোরে যেন নিতে আহে
নাইওরেরও লাইইইইই!!

প্রায় প্রতিরাতেই ঘুরেফিরে এই একটা গানই গাইত! প্রতিটি লাইন আলাদা জোর দিয়ে। ভিন্ন জোশ নিয়ে। বিশেষ করে 'হেইয়ারে' বলার সময় সবার সম্মিলিত কোরাস যেন চরাঞ্চলের নিঝুম রাতের স্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিত। একজন গাইত, বাকিরা সঙ্গ দিত। গান গাওয়ার এক পর্যায়ে, কয়েকজনের মধ্যে 'জলজলা' চলে আসত। মাতালের মত হয়ে অপার্থিব এক শক্তিতে লাফাতে শুরু করত। ভীষণ জোরে জোরে ফোঁস ফোঁসসস করে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বেরুতে থাকত! কিছুক্ষণ এমন করার পর, আস্তে নেতিয়ে পড়ত! কখনো কখনো তাদেরকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে পিটিয়ে শান্ত করতে হত! জলজলা থামার সময় মুখের কষ বেয়ে ফেনা ভাঙতেও দেখেছি! আবার কয়েকজন 'মোরে যেন নিতে আহে' বলে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠত! যে সে কান্না নয়, অনেক গভীর থেকে উঠে আসা কান্না! তাদের সামনে হয়তো ফুটে উঠত, একটি অসহায় মেয়ের করুণ মুখচ্ছবি! স্বামীর বাড়িতে কষ্টের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে আসার পর আর বাপের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কেউ নিতে আসেনি। গরীব বাবা ভয়ে এদিকে আসার সাহস পায় না। আসা-যাওয়ার খরচাপাতির যোগাড় নেই যে! মেয়েকে নাইওর নিতে হলে আলাদা নৌকায় চড়িয়ে নিতে হবে। আসার সময় নানা 'তত্ব' নিয়ে আসতে হবে!

ফসল উঠলে বিক্রি করে যদি হাতে অতিরিক্ত কিছু থাকে, তাহলেই মেয়েকে আনার চিন্তা করা যাবে। কিন্তু ফসল উঠতে এখনো বহু দেরি। ততদিনে মেয়েটা আমার, বেঁচে থাকবে তো!

এদিকে মেয়েটা মা-বাবার বিরহে, ভাই-বোনের বিরহে, উঠোনের বাতাবি লেবু গাছটার বিরহে, গুমরে গুমরে মরে। স্বামীর বাড়ির পাশ দিয়েই বয়ে গেছে নদী। পাল তুলে সারি সারি নৌকা যায়-আসে। বিয়ের পর এমন এক নৌকায় করেই রাঙা বৌ হয়ে এসেছিল। নদীর দিকে তাকালে মনটা হু হু করে ওঠে। এই নদীরই উজানে আমার বাড়ি! আমাদের হাঁসগুলো নদীতে চরে। একটা হাঁস ভেসে আসতে পারে না! পানিতে ভেসে যাওয়া সেগুন পাতাটা কি আমাদের গাছের?

কামলাদের স্বরটা ক্রমশ বেদনাবিধুর হয়ে উঠত। গাঁয়ের বধূর সমস্ত কষ্ট যেন তাদের কণ্ঠ দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ত। গানের মাঝামাঝিতে এক দুজন কাঁদত, গান শেষ হলে একসঙ্গে সবাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। তাদের কান্নার তোড়ে ঘরের মহিলারাও কাঁদত। গান শোনার জন্য সন্ধ্যার পর থেকেই আমার মনিববাড়িতে কুটুম ও পড়শিবাড়ির মহিলারা ভিড় জমাতো। এই ওই গান সামনে রেখেই বোধ হয় পরবর্তীতে প্রায় বিশ বছর পরে ১৯৭০ সালে রচিত হয়েছে—

কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া
আমার ভাইধনরে কইয়ো নাইওর নিতো বইলা!

আমি কাছারি ঘরে চলে আসার পর আর গান শুনতে পারিনি। কিভাবে যেন বাড়ির লোকজন টের পেয়ে গেছে, আমি পালিয়ে এসেছি। পড়ালেখা করা ছাত্র আমি। ব্যস আমার মেঠো কাজ বন্ধ হয়ে গেল। প্রস্তাব এল, বাড়ির ছেলেমেয়েদেরকে পড়ানোর। কাছে-পিঠে কোনো ইশকুল-মাদরাসা নেই। বাড়িতেই লজিং মাস্টার রেখে পড়ানোর নিয়ম। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই নিরক্ষর থেকে যায়। যাদের বাড়ির কেউ শহরে থাকে, পড়াশোনা করা কেউ থাকে, তারাই ঘরের ছেলেপিলেদের লেখাপড়ার কিছুটা উদ্যোগ গ্রহণ করে। শুরু হল নতুন জীবন। মাস্টারি করা। ছাত্রসংখ্যা এক দুজন নয়! পুরো এক পল্টন! মনিব বাড়ি, পাশের বাড়ি, তার পাশের বাড়ি। পুরো গ্রাম। মসজিদের ইমামতিও জুটল। খাওয়া-দাওয়ার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্য বাড়িতে খাওয়া মনিব পছন্দ করতেন না! মনিবগিন্নি তো শুনতেই পারতেন না। আমাদের হুজুরকে আমরা খাওয়াব। তোমাদের

ছেলেপিলেদেরকে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছি, এই ঢের! তারপরও কি মহিলাদের কোমল আবেগ 'দাবায়া' রাখা যায়? হুজুরের জন্য কিছু একটা করতে না পারলে, ইহজনম বৃথা! এ বাড়ি থেকে পিঠা পাঠাচ্ছে, ও বাড়ি থেকে শিন্নি পাঠাচ্ছে! কিছু না কিছু আসার বহর লেগেই আছে! মধুর উৎপাতে জীবন চিৎপাত! কোন ছাত্রের মা আমার কাছে বেশি প্রিয় হবে, এ নিয়েও চাপা দ্বন্দ্ব শুরু হলো।

এলাকায় একজন বড় আলিমের বাড়ি ছিল। তিনি একটি বড় মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। ছুটিতে বাড়ি এসে আমাকে দেখলেন। সবকিছু জানার পর পরামর্শ দিলেন, তুমি কেন এখানে পড়ে আছো! সুন্দর ভবিষ্যত নষ্ট করছো? চলো আমার সঙ্গে, আমাদের মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেব! এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। জায়গির বাড়িতে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানালাম। তারা বেঁকে বসল! কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না। হুজুরের শরণাপন্ন হলাম। তিনি সবার সঙ্গে কথা বললেন। রাজি করাতে পারলেন না। আমি ঠিক করলাম, আবার পালাব। মতিগতি দেখে জায়গির (লজিং) বাড়ির কর্তা পাল্টা একটা প্রস্তাব দিলেন। তারা আমাকে সাইকেল কিনে দেবেন। আমি আসা যাওয়া করে পড়ব। এতে তাদের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েগুলো শিক্ষার আলো পাবে। কুরআন পড়া শিখতে পারবে। নইলে সব আগের মত মূর্খ থেকে যাবে!

হুজুর দেখলেন, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সম্মতি দিলেন। তখনকার যুগে মাদরাসার তালিবে ইলমরা অনেকেই জায়গিরে থেকে লেখাপড়া করত। আশপাশের ছোট ছোট বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাত। এভাবেই আলিমগণ গ্রামবাংলায় শিক্ষার বিস্তারে কার্যকর ভূমিকা রেখে এসেছেন।

আবার শুরু হল পড়াশোনা। সঙ্গে চলতে লাগল শিক্ষকতা। এলাকায় গ্রহণযোগ্যতাও আগের তুলনায় শতগুণ বেড়ে গেল। আব্বাজান কিভাবে কিভাবে খোঁজ পেয়ে মাদরাসায় হাজির। কিছুতেই আমাকে ছাড়বেন না। সঙ্গে করেই নিয়ে যাবেন। আমার যেতে ইচ্ছে হলো না। সেটা সরাসরি আব্বাকে বলার হিম্মত ছিল না। তাকে হুজুরের কাছে নিয়ে গেলাম। হুজুর আব্বাকে অনেক করে বোঝালেন। আব্বাজান যে শক্ত মানুষ। তাকে বুঝিয়ে নিজের মত থেকে টলাবে, এমন মানুষ পাওয়া ভার! শেষে আমি মরিয়া হয়ে বললাম, আপনি তাহলে আজ আমার সঙ্গে চলুন। বিদায় নিয়ে আসি। তাতেও তিনি রাজি নন! পরে কী ভেবে রাজি হলেন। নিয়ে

গেলাম। জায়গিরদারকে সব কথা খুলে বললাম। এককান দুকান হতে হতে চারদিকে ছড়িয়ে গেল আমার চলে যাওয়ার কথা। দশদিক থেকে মানুষ এসে জড়ো হলো। সবাই মিলে পারলে আব্বাজানের পায়ের উপর পড়ে, এমন অবস্থা! আব্বাজান শিক্ষিত মানুষ। তিনি বোধহয় উপলব্ধি করলেন, এই অজপাড়াগাঁয়, আমার কারণে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে কুরআন শরীফ পড়া শিখছে! অক্ষরজ্ঞান অর্জন করছে, কাজটা তুচ্ছ করার মত নয়! তিনি শিক্ষক, শিক্ষার গুরুত্ব বোঝেন। সে রাতে থাকলেন। সবাই তাকে মাথায় তুলে রাখল। আব্বা আমার পড়ানো দেখলেন। আশপাশের সবার কাছ থেকে আমার সম্পর্কে রিপোর্ট নিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নিলেন। আমার আসার আগের অবস্থা আর পরের অবস্থা সম্পর্কে খুঁটে খুঁটে প্রশ্ন করলেন। সকালে উঠে বললেন,

-তুই এখানেই থাক! তোর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এলাকায় কুরআন কারীম শিক্ষা চালু করেছেন! এটা বহুত বড় সৌভাগ্যের বিষয়। তোর মা তোর জন্য চিন্তা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন! তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে হলেও তোর একবার বাড়ি যাওয়া দরকার!

বাড়ি গেলাম। মাদরাসা খোলা, তাই দেরি না করে চলে এলাম। সামনে শুক্রবার দেখে বেড়াতে আসব! আম্মাকে আশ্বস্ত করলাম। মনে আর কোনো গ্লানি রইল না। অপরাধবোধ রইল না। একমনে পড়াশোনা করতে লাগলাম। জায়গির বাড়িতে পড়ানোর কাজও চলতে লাগল। পাঞ্জেগানা থেকে মসজিদটা জামে মসজিদে রূপান্তরিত হলো। সাথে সাথে আমারও উত্তরণ ঘটতে লাগল! .এভাবেই দাওরা শেষ হলো। হুজুরগণ হুকুম করলেন, মাদরাসার শিক্ষকতায় যোগ দিতে! যেখানে এতদিন পড়াশোনা করেছি, সেখানেই শিক্ষকতার সুযোগ পাওয়া আমার জন্যে অনেক আনন্দের। আব্বাজানও ভীষণ খুশী, ছেলে এমন বুযুর্গানে কেরামের মাদরাসায় শিক্ষকতার সুযোগ পেয়েছে।

আম্মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাড়িতে তার সেবাযত্ন করার কেউ নেই। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আব্বাও বৃদ্ধ! চাকুরি থেকে রিটায়ার্ড করেছেন আরো আগে। আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দেরি করলাম না। এতদিনের সমস্ত সম্পর্ক বন্ধনের মায়া ত্যাগ করে বাড়িতে চলে এলাম। মায়ের সেবার জন্যে মাদরাসা থেকেও সাময়িক অব্যাহতি নিলাম। আম্মু রোগশয্যায় থেকেই অন্যকিছুর কলকাঠি নাড়ছিলেন। বুঝেও না বোঝার ভান করলাম। বোন বেড়াতে এল। আব্বুও দুর্বল শরীরে, এখানে ওখানে

যাচ্ছেন। অবস্থা যা দেখছি, আর বেশি দেরি নেই। আব্বু কী মনে করে একদিন আমাকে না জানিয়ে, আমার মাদরাসায় গেলেন। আমার 'খাস' উস্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন, জায়গির বাড়ি থেকে আমার উস্তাদকে একটা প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তিনি সময় সুযোগের অভাবে প্রস্তাবটা আব্বার কাছে পৌঁছাতে পারেননি। আব্বাজান দেরি না করে হুজুরকে নিয়ে জায়গির বাড়িতে গেলেন। ফিরে এসে আমার মতামত চাইলেন। আমার অমত করার কী আছে! পাত্রীকে সেই ছোটবেলা থেকেই চিনি। আমার জীবনের প্রথম ছাত্রী। খেলার সাথীও বলা চলে। বাড়ির সবার ছোট! সবার আদরের! আদরে কিছুটা বাঁদরও হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম তার বাঁদরামির কারণে আমার জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠার যোগাড় হয়েছিল। আস্তে আস্তে তাকে পোষ মানাতে হয়েছিল। আমি নতুন করে মাদরাসায় পড়াশোনা করার পর, হুজুরদের হুকুমে পর্দা করতে শুরু করেছিলাম। সেও বড় হয়ে গিয়েছিল। তার বড় ভাইয়া থাকত ঢাকায়। তাকে সেখানে নিয়ে রেখেছিল। শহরে থেকে যেন কিছু আদব-সহবৎ শিখতে পারে! ভবিষ্যতে বিয়েশাদি দিতে সুবিধা হবে। আগের বোনদের বিয়েও এভাবে হয়েছে। শহরে নিয়ে যাওয়ার পর, ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছে। ছোট মেয়েরও এমনি হওয়ার কথা ছিল। ঈদে-চাঁদে বড়ভাই-ভাবীর সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে আসত। পর্দার আড়াল থেকে একবার কুশল বিনিময় করে যেত। ব্যস, আর কোনো যোগাযোগ থাকত না। সে থাকত ভেতর বাড়িতে। আমি থাকতাম সারাদিন মাদরাসায়। তারপর মসজিদে। শুধু খাবারের সময় টের পেতাম, বাড়তি যত্নের ছাপ! বুঝতাম এটা গুরুর প্রতি শিষ্যার শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ।

আমরা ছিলাম নিম্ন মধ্যবিত্ত! বাবা সাধারণ একজন শিক্ষক। আমার স্ত্রী ছিল বনেদি বড়লোক! গ্রামে জন্ম হলেও সে শহরে থেকে এসেছে। আমার মনে একটু খটকা ছিল, সে আমাদের গরীব পরিবারে মানিয়ে নিতে পারবে তো! আমি জায়গির ছেড়ে চলে আসার পর, আম্মাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম! ওদিকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুযোগ পাইনি! আমার জন্যে পাত্রী দেখা হচ্ছে, এ-সংবাদ কিভাবে যেন জায়গিরবাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল! সে তখন বাড়িতে। ধানকাটা উপলক্ষে শহর থেকে বেড়াতে এসেছে! সবকথা জানার পর, সে-ই আগ বেড়ে ভাবীকে বলেছে, আব্বু-আম্মুর অমত না থাকলে, কারো মারফতে 'ওনাদের' বাড়িতে একটা প্রস্তাব পাঠানো যেতে পারে! ব্যস, এটুকুই!

বিয়ের পর প্রথম দিকে আমার মনে হত, সে এ-বিয়েতে খুব খুশি! আম্মার অসুস্থতার খবর শুনে সে না-কি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। আমার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও, সে এদিকের খবরাখবর নিয়মিতই রাখত। মায়ের সেবার জন্যে সব ছেড়ে বাড়িতে এসে থিতু হয়েছি, এতে সে খুবই খুশি হয়েছে। আমার বিয়ের কথা ওঠার আগেও সে ভেবেছে, আমার একজন সঙ্গী দরকার! একটা ছেলের পক্ষে একা একা অসুস্থ মায়ের সেবা করা কঠিন!

আমার কাছেই নিজের অর্জিত শিক্ষার অনেকটা সে অর্জন করেছে। শহরে গেলেও সে কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়নি। বাসায় থেকেই বইপত্র পড়ত। ভাবীর কাজে সাহায্য করত। সেলাইফোঁড় শিখত। একটা কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই সে আমার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছে! আলহামদু লিল্লাহ! সে খুব ভালোভাবেই আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। তার অক্লান্ত সেবাশ্রমেই আম্মা শেষ কয়টা দিন আরামে কাটিয়েছেন। আব্বাও পুত্রবধূর প্রতি ভীষণ কৃতজ্ঞ ছিলেন। তার জন্যে নিয়মিত দু'আ করে গেছেন।

তার মধ্যে প্রথম পরিবর্তন দেখি এক ঈদে বাপের বাড়ি যাওয়ার পর! তার বোনেরা সবাই বড়লোক! ভগ্নিপতিরা অর্থবিত্তের অধিকারী। তাদের তুলনায় আমি কিছুই না। একদম না। কোনো বোন হয়তো তাকে কানপড়া দিয়েছে। তার মধ্যে অর্থের মোহ ঢুকিয়ে দিয়েছে। বেড়ানো শেষে তাকে নিয়ে এলাম। লক্ষ্য করলাম, সে সারাদিন কেমন যেন গোমড়া গোমড়া হয়ে থাকে। আস্তে আস্তে সে নানা অভাবের কথা বলতে শুরু করল। এটা নেই, ওটা নেই! দিনদিন বেড়েই চলল, তার নাই নাই ভাব! আমি মাদরাসায় পড়াই। তার এতকিছুর চাহিদা পূরণ কিভাবে করি! আর এতদিন তো সে অভাব-অনটনের মধ্যেই সুখী ছিল। হঠাৎ কেন তার এই পরিবর্তন! নতুন এক উপসর্গ দেখা দিল, তার মধ্যে আমাকে ছেড়ে বাপের বাড়ি থাকার প্রবণতা আশংকাজনক হারে বেড়ে গেল। বাধ্য হয়ে রেখে এলাম। দিনের পর দিন আমি ঘরে একা একা থেকেছি। আনতে গেলে, সে আমার সঙ্গে দেখা করেনি। খালি হাতে ফিরে এসেছি।

দিনরাত আল্লাহর কাছে দু'আ করেছি। কিছুদিন পর আমার শাশুড়ি মারা গেলেন। তারপর শ্বশুর আবার বিয়ে করেছেন। ও তখনো বাপের বাড়িতে। একদিন ভোররাতে উঠে আমার আচানক মনে হল, সৎ মায়ের সঙ্গে থাকতে তার হয়ত ভাল লাগছে না। দেখি না চেষ্টা করে। দেরি না

করে তাকে আনতে গেলাম। এবার আর দ্বিমত করল না। আল্লাহ তা'আলা তাকে সুমতি দিয়েছেন। বাড়িতে এসেই, গত দুবছর সে আমার সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তা পুষিয়ে দেয়ার জন্যে উঠেপড়ে লাগল। এত অবহেলা অনাদর সত্ত্বেও আমি তার সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণ করিনি, রাগ দেখাইনি। আবার বিয়ে করিনি। লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে বারবার তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েও হাল ছাড়িনি। এ-বিষয়টা তার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। এতদিন তার উপেক্ষামূলক আচরণের কারণে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলাম। এবার তার অতি আদর-যত্নের ধাক্কায় জীবন অতিষ্ঠ(!) হয়ে উঠল। হারিয়ে যাওয়া দুবছরের সেবাযত্ন একসঙ্গে করে ফেলতে চাইছিল। তার দেখাদেখি আমার মধ্যেও কেমনযেন বোধ তৈরি হল। আমিও তাকে আগের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে শুরু করলাম। এভাবেই তার সঙ্গে আমার দ্বিতীয় জীবনের সূচনা। সে থেকে আজ পর্যন্ত আর কখনো দুজনের মনোমালিন্য হয়নি।

***

আমাদের একটা চোখ সবসময় হুজুরের দিকে পড়ে থাকত। হুজুর কখন বাড়ি যাবেন। বুড়ো হুজুর বাড়িতে যাওয়ার পর বুড়িমা যেখানেই থাকতেন, চিলের মত ছুটে আসতেন। হাত ধরে ঘরে নিয়ে যেতেন। একটু পর হুজুর আবার ফিরে আসতেন। মাদরাসার বড় ভাইয়েরা দুষ্টুমি করে তাদের নাম দিয়েছিলেন, 'চাঁইয়াঁ'। মানে চড়ুই দম্পতি। শুধু তাই নয়; আসরের নামাজের পর, মাতবাখ থেকে ভাত উঠিয়েই আমরা সবাই দৌড় দিতাম মাদরাসার পুরনো মসজিদের দিকে। সেখানে অনেক চড়ুই পাখির বাসা। প্রতিদিন না পারলেও প্রায় দিনেই চড়ুই ধরে নিয়ে আসতাম। বুড়ো হুজুরকে দিলে কী যে খুশি হতেন, বলে বোঝানোর মত নয়!

-আমরা মনে করতাম চড়ুই পাখির গোশতে বাড়তি পুষ্টি আছে। দুর্বলতা বিনাশ করে। অনেক দিন পর, এই কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি, এটা চরম একটা ভুল ধারণা! চড়ুইয়ের গোশতে বাড়তি কোনো 'শক্তি' নিহিত নেই! ওসব চড়ুই-ফড়ুই কিছু না। মনে রঙ থাকলে, জীবনসঙ্গীকে ভালবাসতে কোনও সমস্যা হয় না। বয়সও কোনো ব্যাপার নয়। ব্যাপার হল মানসিকতা আর সদিচ্ছা।

আমাদের হাতে কখনো একাধিক চড়ুইও ধরা পড়ত। বুড়িমা তখন আমাদেরকে চড়ুইভাতিতে দাওয়াত দিতেন। আমরা কব্জি ডুবিয়ে পেটপুরে

চেটেপুটে হাঁড়ির সব ভাত খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতাম। আরও বেশি চড়ুই কিভাবে শিকার করা যায়, তার ফন্দিফিকির জপতাম। নিত্যনতুন ফন্দিও বের হতো। চুড়ইয়ের পাশাপাশি আমরা ধরতাম 'ধঁলিবগা'। ধঁলি মানে 'গলা'। এই বকগুলোর গলা ছিল অস্বাভাবাবিক রকমের লম্বা। বকশিকারের জন্যে অনেক প্রস্তুতি নিতে হত। প্রায় পুরো সপ্তাহ লেগে যেত প্রস্তুতিতে। গুলতির মতো গাছের ডাল খুঁজে বের করতে হত। ছাতার শিক লাগত। নাইলনের চিকন সুতো লাগত।

গাছের ডালের ব্যবস্থা বুড়িমা করতেন। ছাতার শিক সংগ্রহ করতাম বাজারের ছাতামিস্তিরির দোকান থেকে। সবকিছু যোগাড় হলে, বুড়িমা 'বগার জাঙ্গি' বানাতে বসতেন। আমরা চারপাশ ঘিরে থাকতাম। বানানোর কায়দাটা শেখার জন্যে। জাঙ্গি বানানো শেষ হলে, রোদে শুকোতে দিতেন। এবার অপেক্ষার পালা। জুমাবারে পড়া নেই। হুজুররা বাড়িতে না হয় জুমা পড়ানোর জন্যে গিয়েছেন। মাদরাসা এখন 'স্বাধীন অঞ্চল'। ফজরের আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু হত। দূরের বিলে যেতে হবে যে। বুড়িমা মধ্যরাতে উঠেই পিঠা বানিয়ে রাখতেন। হুজুর তাহাজ্জুদের জন্যে উঠতেন তিনটার দিকে। বুড়িমাও সাথে উঠতেন। স্বামীকে পানি গরম করে দেয়ার জন্যে। বুড়িমা হুজুরকে নামাজে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, আমাদের জন্যে পিঠা বানাতে বসতেন। আমরা ফজরের আগেই ঘরে হাজির হয়ে যেতাম। হুজুর না দেখে মতো করে লুকিয়ে, বুড়িমা আমাদেরকে পিঠা ও জাঙ্গি দিতেন। আমরা দ্রুতপায়ে হাঁটা ধরতাম। জলাভূমি (বিল) ছিল মাদরাসা থেকে অনেক দূরে। আঁধার থাকতে থাকতেই পৌঁছতে হত। কারণ বকেরা একদম ভোরেই বাসা ছেড়ে হাজির হতো দলে দলে। মাছশিকারের আশায়। শিকারি আমাদের শিকারে পরিণত হত। আমরা প্রথমে বড়শি দিয়ে ছোট মাছ ধরতাম। তারপর সে মাছকে টোপ হিশেবে জাঙ্গিতে আটকে দিতাম। তারপর শুরু হত অপেক্ষার পালা। দূরে গিয়ে বড়শির ছিপ ফেলে ঠায় বসে থাকতাম। কখনো সাথে জালও থাকত। জাঙ্গিতে বক আটকাপড়ার পর, জাল মারা শুরু হত। মাছ-গোশত একসাথে নিয়ে ফিরতাম। বুড়িমা যারপরনাই খুশি হতেন।

***

তারা দু'জন ছিলেন 'মেড ফর ইচ আদার'। বুড়ো হুজুর সপ্তাহে একদিন শহরে যেতেন। তাবলীগের মারকাজে শবগুজারি করতে। প্রায়ই এমন

হয়েছে, রাতের বেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, হুজুর প্রায় দশ কিলোমিটার পথ হেঁটে বাড়ি চলে এসেছেন। থাকতে পারেননি। শবগুজারিতে গেলে, হুজুর আমাদের ছোটদের তিনজনকে ঘরে রেখে যেতেন। জামাত করে নামায পড়তে সুবিধা হবে, তাই তিনজন। সে এক অবিশ্বাস্য আনন্দজনক স্মৃতি। প্রতি বৃহস্পতিবারে কোন তিনজন থাকবে, সেটা নিয়েও পুরো সপ্তাহ জুড়ে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করত। গোপনে প্রতিযোগিতা চলত, কে বেশি শিকার ধরতে পারে! তাহলে বুড়িমার কাছে প্রিয় হওয়া যাবে।

বৃহস্পতিবার আসরের আগে হুজুর বের হতেন। পরদিন ফজর পড়ে চলে আসবেন! এই সামান্য সময়ের বিরহেও দুজন কী যে অসম্ভব কাতর হয়ে পড়তেন— বলে বোঝানোর মত নয়। বুড়িমা নয়নজলে ভাসতেন, বুড়ো হুজুরও রুমালে চোখের কোণ মুছতে মুছতে বগলে ছাতা নিয়ে কোণাকুণি পথ ধরতেন। সে এক দেখার মত দৃশ্য। আমরা হুজুরকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতাম। মাগরিব পড়ে ঘরে ফিরতাম। এর মধ্যে বুড়িমা আমাদের জন্যে নাস্তা তৈরি করে ফেলেছেন। বুড়িমার পুত্রবধূ এসব কাজে অংশ নিত না। আলাদা ঘরে থাকত। ওটা ছিল এক অদ্ভুত 'চরিত্র'। ছেলেটাও পুরো বউয়ের পোষা ভেড়ায় পরিণত হয়েছিল। যাক সে কথা। হুজুর যাওয়ার সময় পই পই করে বলে যেতেন,

-গল্পগুজবে সময় নষ্ট না করে পড়বে! খোশখত (সুন্দর হস্তলিপি) লিখবে।

হুজুর সুন্দর কলম বানাতে পারতেন। বুড়িমার হাতে বানানো কলম ছিল আরো লা-জবাব! বুড়িমা নিজেই বাঁশঝাড়ে চলে যেতেন। বেছে বেছে 'বাতি' দেখে বাঁশের ছিপ এনে কলম বানিয়ে দিতেন। কয়লার গুড়ো পানিতে গুলে কিভাবে যেন ঘন করে কালি বানিয়ে দিতেন। আমরা লিখতে বসলে তিনি পাশে থেকে দেখতেন। গুটুর গুটুর পান চিবুতেন আর গুজুর গুজুর গল্প বলতেন। রাতে ইশার পরপরই আমাদেরকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। তারপর তিনি উঠোনে মাদুর পেতে বসে থাকতেন। আমাদের বুঝতে বেগ পেতে হত না, তিনি হুজুরের অভাব বোধ করছেন। রাতে একা একা তার ঘুম আসবে না। এভাবে সারারাত জেগে বসে থাকবেন। তাসবীহ পড়বেন। নামাজ পড়বেন। সারা উঠানময় হেঁটে বেড়াবেন! কোনো এক অপ্রত্যাশিত রাতে, বুড়ো হুজুর চলে আসেন। চাঁদের আলোয় দুজনে একজন আরেকজনের হাত ধরে, একে অপরের

দিকে চেয়ে আছেন! দীর্ঘ সময় ধরে! এমন দৃশ্য নিজ চোখে দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছে! হুজুর ঘরে এসেই কল চেপে হাত-পা ধুতেন। সে রাতেও তাই করলেন। আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। তারপর ঘটল সেই অপার্থিব দৃশ্য! আচ্ছা, তারা দু'জনে অপরের মুখের বলিরেখার মধ্যে কী খুঁজে বেড়াতেন এত দীর্ঘ সময় ধরে! চাঁদের মায়াবী আবছা আলোয়? জোছনার অপার্থিব রহস্যঘেরা আলোতে?

দুজনের অকৃত্রিম ভালোবাসার মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর ঘটনাও নিয়তঃ ঘটে চলেছিল। হুজুরের ছেলে আর বউয়ের মাঝে বনিবনা হচ্ছিল না। ছেলে ভেড়া হলেও বউটা ছিল সাক্ষাত নেকড়ে! বউটাকে ভীষণ হিংসুটে মনে হত আমাদের কাছে। আমরা ঘরে গেলে, বুড়িমা কত আদর করতেন! কিন্তু বৌটি এসবের ধারও ধারত না। উল্টো শাশুড়ির আচরণকে আদিখ্যেতা বলে নাক সিঁটকাত।

বুড়োবুড়ির এমন অকৃত্রিম মহব্বতপূর্ণ দাম্পত্যজীবন পুত্রবধূর সহ্য হচ্ছিল না। তার মনে হয়ত খেদ ছিল— তাদের কী হলো? তারাও কেন বুড়োবুড়ির মতো পরস্পরকে ভালোবাসতে পারছে না? ছেলে যতই দুষ্ট হোক, মা-বাবাকে অশ্রদ্ধা করতে পারে না। কিন্তু দজ্জাল পুত্রবধূ শ্বশুর-শাশুড়ির পবিত্র ভালোবাসা সইতে না পেরে, নানাভাবে মনের কেনা উদ্ধার করতে লাগল। ছেলেও তার চণ্ডালমার্কা বিবিকে খোঁটা দেয়,

-দেখ, আম্মুর এত বয়েস হয়ে যাওয়ার পরও, কিভাবে আব্বুকে ভালবাসেন! তোমার কী যে হলো, কোনও কিছুতেই তোমার আগ্রহ খুঁজে পাইনা। কেমন শীতল আর নিস্পৃহ তুমি! মাঝে মধ্যে মনে হয়, তুমি বোধ হয় নারী নও!

-বিয়ের সময় তো আমাকে নারী মনে করেই আকদ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলে!

-তখন কি আর বুঝতে পেরেছিলাম, আমি এক নিরুত্তাপ শীতলা বুড়িকে বিয়ে করতে যাচ্ছি!

এসব ঝগড়া মাঝেমধ্যে আমাদের সামনেই লেগে যেত। বুড়িমা দেখেও না দেখার ভান করতেন। বউ তার বুড়ি শাশুড়িকে মনের মতো করে জব্দ করতে না পেরে ভেতরে ফুলতে ফুলতে থাকত। স্বামীকে বেশি কিছু বলতে পারত না। শাশুড়ির উপর তার ঝাল ঝাড়ত। বুড়িমা ধৈর্যের

প্রতিমূর্তি। অচঞ্চল! তিনি কারো কাছে অভিযোগ করেন না। শুধু বড় মেয়েটা নাইওর এলে, তাকে মনের কথা খুলে বলেন।

***

বুড়িমা তার জীবন নিয়ে খুবই সুখী! শুধু বৌমার আচরণ মাঝেমধ্যে অসহ্য হয়ে যায়! কী আর করা, একজন মানুষ সবদিক থেকে সুখী হতে পারে না! বুড়িমা এক বৃহস্পতিবার রাতে আমাদেরকে ভাত বেড়ে দিতে দিতে বলেছিলেন,

-আমার বৌমাটা আল্লাহ কেন এমন করেছেন তোরা জানিস?

-জি না! কেন এমন করেছেন?

-আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য!

-আপনি এত ভালো মানুষ, আপনার আবার কিসের পাপ!

-ঐ যে বিয়ের পর তোদের হুজুরের সঙ্গে বছরদুয়েক দুর্ব্যবহার করেছিলাম! সে পাপ! মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে! আমি 'তার' কাছে, আমার সেই অন্যায় আচরণের জন্যে হাজারবারেরও বেশি ক্ষমা চেয়েছি! তারপরও এমন ফিরিশতাতুল্য মানুষকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহর বোধহয় পছন্দ হয়নি! দুনিয়াতেই তার ফল ভোগ করাচ্ছেন।

***

সপ্তাহের শেষ দিন। হুজুর মারকাজে যাবেন। শবগুজারিতে। বুড়িমা রাতের জন্য শুকনো খাবার তৈরি করে দেবেন। যোগাড়-যন্ত্র করছেন। একটু আগে বাজার থেকে মিঠাই এনে হুজুরকে দিয়েছি! হুজুর আমাদেরকে পড়া দিয়ে মিঠাই নিয়ে ঘরে গেলেন। বুড়িমা যথারীতি এগিয়ে এসে স্বামীকে বরণ করে নিলেন। হুজুর কিছুক্ষণ পর মাদরাসায় ফিরে আমাকে পাঠালেন। গরুটা মাঠে বাঁধা আছে। নিয়ে আসতে হবে। আজকের দুধটা দোহানো হয়নি। নাতির জন্যে সেমাই রান্না করতে দুধ লাগবে। এক দৌড়ে গরু নিয়ে এলাম। বাছুরটা বাঁধা ছিল। রশি ছুটিয়ে মায়ের কাছে নিয়ে এলাম! ওলানে মুখ লাগিয়ে 'পানিয়ে' বাছুরটাকে আবার বেঁধে রাখলাম! বুড়িমা ছোট্ট একটা বালতি নিয়ে এসে পিঁড়িতে বসলেন। দুধ দোহানো শুরু করবেন, এমন সময় তার পুত্রবধূ এসে হাজির! বলা-কওয়া ছাড়াই হ্যাঁচকা টানে বুড়িমার হাত থেকে বালতিটা একপ্রকার ছিনিয়ে নিল। দাঁত কিড়মিড় করে হিসহিসিয়ে বলল,

-আপনি কেন দুধ দোহাতে এসেছেন? আপনার তো এখন ঘরে থাকার কথা! আপনার অপবিত্র হাতের দোহানো দুধ দিয়ে মাসুম বাচ্চার জন্য সেমাই রান্না করব?

***

হুজুর কোথাও বেড়াতে গেলে মাঝেমধ্যে বুড়িমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। সেখানে গেলেও দুজন কাছছাড়া হতেন না বড় একটা! বিয়েবাড়ির বিজবিজে ভিড়েও দুজনকে দেখা যেত নির্জন একটা কামরায় হাত ধরাধরি করে বসে আছেন। আপনমনে দুজনে কথা বলছেন। গল্প করছেন। অন্যরা তাদের নিয়ে হাসাহাসি করছে, চোখ টেপাটেপি করছে, সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই।

দ্বিতীয় বাসর

আপন ডেরা ছেড়ে কোথাও যাওয়া খুব একটা হয় না। একান্ত বাধ্য হলে বা অতি আপন কারো নাছোড়বান্দার ঝুলোঝুলিতে বের না হয়ে উপায় থাকে না। আর বিয়ের দাওয়াত হলে তো, সভয়ে এড়িয়ে চলি। কিন্তু এবারের দাওয়াতটা প্রথমত এসেছে অতি আপন একজনের কাছ থেকে। তদুপরি যার বিয়ে, সে মানুষ হিশেবে বড় 'ইন্টারেস্টিং কারেক্টার'। আলেম হয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আছে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্লাস করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বয়েস নিতান্তই কম। চাকরি-বাকরি নেই; তবুও চক্ষু-লজ্জার মাথা খেয়ে বাবা-মায়ের কাছে বায়না ধরেছে, বিয়ে করব। স্কুলে ক্লাস করতে সমস্যা হচ্ছে।

ছেলেটা খেয়ালি প্রকৃতির। নাম ধরা যাক 'সালেহ'। আসলেও মানুষটা সালেহ। বেজায় সৎ। তার শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই দেখে আসছি। ক্লাসের সবার চেয়ে অনেক ছোট হয়েও, মেধায়-মননে, তাকওয়া-পরহেজগারিতে অনেক অনেক এগিয়ে। গুনাহের দূরতম সম্ভাবনার পথও সে সযত্নে এড়িয়ে চলত। ওজু-ইস্তিঞ্জার সময় তার অতিসতর্ক আচরণ দেখে অপরিচিত কেউ তাকে শুচিবায়ুগ্রস্ত ভেবে বসতে পারে। কিছু মানুষ সাধারণত ধর্ম পালন করতে এসেও সুবিধার 'মাসয়ালা' খোঁজে। সালেহ সবসময় 'আযীমত' খোঁজে। তার বক্তব্য হল, রুখসত হবে সাধারণ মানুষের জন্য। আমি একজন আলেম হয়েও কেন 'সুবিধা' খুঁজতে যাবো?

-কিন্তু নবীজি তো সবসময় প্রতিটি কাজের সহজটাই গ্রহণ করেছেন?

-সেটা জীবনের ক্ষেত্রে, শরীয়তের ক্ষেত্রে নয়। না হলে সারারাত না ঘুমিয়ে তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে পা ফুলিয়ে ফেলতেন কেন? সেটা বুঝি সহজ পন্থা অবলম্বন? কাফেরদের সঙ্গে আপোসে না গিয়ে যুদ্ধে জড়ালেন কেন? কা'ব বিন আশরাফকে ক্ষমা না করে হত্যা করতে মৃত্যুদূত কেন পাঠালেন? বনু কুরায়জাকে ক্ষমা না করে কচুকাটা কেন করলেন?

তার যুক্তি অকাট্য। মানুষ ছোট হলেও, চিন্তাটা বড় গভীর। কুরআন কারীম আর হাদীস শরীফের সঙ্গে তার সরাসরি সম্পর্ক। সে তাফসীর বা হাদীসের ব্যাখ্যা পড়ার সময় প্রথমেই খাইরে কুরুন (প্রথম তিন যুগ)-এর বক্তব্যটা জানার চেষ্টা করে, তারপর বর্তমান সময়ের ওলামায়ে কেরামের দিকে রুজু করে। তার কথা হলো,

-"আমি সহজটা গ্রহণ করব, যখন আমার সঙ্গে আরো মানুষের ভাগ্য জড়িত থাকবে তখন। কিন্তু যখন আমি একা থাকব তখন আমাকে দেখতে হবে শরীয়তের মূল মাকসাদ কী? আমলটা কোন পদ্ধতিতে করলে, আমার রব বেশি খুশি হবেন! আমি একজন আলিম। আমি আর আমজনতা এক হয়ে যাব কেন? আমি যদি প্রতিদিন ভোরে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ি, সেটা বুঝি কঠিন পন্থা অবলম্বন? আমি যদি প্রচণ্ড শীতের রাতেও ওজু ভাঙার সাথে সাথে আবার নতুন ওজু বানিয়ে নিই, সেটা বুঝি আযীমত? আমি যদি প্রতিবার হাদীসের কিতাব পড়ার সময় ওজু না থাকলে, নতুন ওজু করে নিই, সেটাকে আপনারা কেন আযীমত বলেন? হ্যাঁ, ছাড় আছে। তাই বলে ওজু করতেও শিথিলতা? আগে আগে মসজিদে যেতেও শিথিলতা করব? আমি তো আমলগুলো সাচ্ছন্দ্যেই করতে পারছি! তাহলে ছাড়ব কেন? আমার মনে হয় কি জানেন, আপনারা আসলে অনেক সহজ রুখসত আমলকেও 'আযীমত' বানিয়েছেন। আপনি করেন না বা করতে চান না বলে অপরজন কেন আমলটা করবে? এমন একটা চিন্তা বা অসূয়া আপনাদের ভেতরে ঘুরপাক খায়! তাই অন্যকে নিরস্ত করে নিজেদের স্বস্তি কুড়োতে চান। আমার চিন্তায় ভুল থাকতে পারে। থাকলে ধরিয়ে দেবেন! আরেকটা কথাও প্রণিধানযোগ্য, আমি সবসময় কঠিন আমল খুঁজি। এটা ভুল প্রচারণা। আমি কোনটা কঠিন, কোনটা সহজ, এই ধারণা থেকে আমল খুঁজি না। আমি খুঁজি কোন আমলটা আমি করতে পারি, এবং কোনটাতে বেশি সওয়াব? কোন আমলটা আল্লাহকে বেশি খুশি করবে?

সহজ-কঠিন সূত্র এখানে অবান্তর! সফরে গেলে ফরয রোজা রাখা না রাখা উভয়টার এখতিয়ার আছে। আমি কী করবো? বড় কোনো সমস্যা না হলে, রোজাটা রেখেই দিব। আপনি হলে কী করতেন? অবশ্যই রাখতেন! তো আমিও তো তাই করছি! আসরের আগের সুন্নাত পড়াটা ঐচ্ছিক। আমি সবসময় পড়ার চেষ্টা করি। এটা বুঝি আযীমত হল? কঠিনের পেছনে ছোটা হলো?"

মাদরাসা পড়ুয়াদের মধ্যেও ভালো মানুষের বিভিন্ন স্তর থাকে। কেউ শরীয়তের নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। আবার কেউ কিছুটা কম। আমাদের সালেহ ছিল ভালোদের মধ্যেও ভালো। তাকওয়ার ছোটখাটো দিকগুলোও সে সযত্নে পালন করত। তার এই তাকওয়াপ্রীতি থেকেই আজকের লেখাটার জন্ম। তার মতো মুত্তাকী খুব কমই দেখেছি।

***

তাকে অনেক করে বোঝানো হলো, তুমি একজন মাওলানা। শিক্ষকতাও করেছ এক বছর। এখন ছোট ছেলের মতো স্কুলে ক্লাস করবে? অনেক ভালো মানুষেরও তো কখনো কখনো বিচ্যুতি ঘটে যায়! সালেহর এক কথা,

-স্কুলে পরীক্ষা আমি দিবই। কোনোরকম কারচুপির আশ্রয় না নিয়েই তা করব। এবং বিজ্ঞান নিয়েই পড়ব। রবের কাছে তাওফীক কামনা করে নিরন্তর দু'আ করে যাচ্ছি, তিনি যেন আমাকে প্রতিকূল পরিবেশেও দ্বীনের ওপর পুরোপুরি অবিচল রাখেন।

-ওখানে সহশিক্ষা! তুমি নজরের হেফাযত কিভাবে করবে?

-সেটা দেখা যাবে, ইনশাআল্লাহ!

আসল ঘটনা হলো, একজন নিকটাত্মীয় তাকে অপমান করে কথা বলেছে। বাংলা-অংক-ইংরেজি-বিজ্ঞান পারে না বলে টিটকারি মেরেছে। বাবা ইঞ্জিনিয়ার, আর ছেলে একজন কাঠমোল্লা, বড় বেখাপ্পা! এটা সালেহকে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। তার আঁতে ঘা লাগার মত অবস্থা। তার আত্মমর্যাদাবোধটা একটু বেশিই টনটনে। আমাদের মত অত ঠুনকো আর পলকা নয়। অল্পবয়েসজনিত আবেগও ছিল হয়তো। মাওলানা হয়ে শিক্ষকতা করলেও, তখনো তার বয়েস ছিল অত্যন্ত কম। সাত বছরেই দাওরা পাশ করে ফেলেছে! তুখোড় মেধার কারণে, কোনো বিষয়ে

যোগ্যতায় তার ঘাটতি ছিল না। একদিনে সে এক সপ্তাহের পড়া পড়তে পারে। কঠিন থেকে কঠিন বিষয়ও তার বুঝতে বেগ পেতে হয় না। যা পড়ে সহজে ভোলে না।

***

দূরে কোথাও গেলে, সময়মত সবকিছু গুছিয়ে ওঠা যায় না। শেষ মুহূর্তে দেখা যায়, কোথাও একটা ঘাপলা রয়ে গেছে। টিকেট পাওয়া যাচ্ছে না, সময়মত কাউন্টারে পৌঁছা যাচ্ছে না, গন্তব্যের মেজবানের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না, আরও কত কি! তবে সেদিন সবকিছু ঠিকঠাক মতোই হলো। বাস ছাড়ল। নতুন জায়গায় যাওয়ার কয়েকটা আনন্দ, নতুন পথ দেখার আনন্দ, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আনন্দ, নতুন রীতিনীতি দেখার আনন্দ, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের আনন্দ!

গাড়িতে বসে দুজনের গল্প-গুজবের আনন্দ তো বাকি সব কিছুকে ম্লান করে দিতে সক্ষম। মনের মত একজন সহযাত্রী থাকলে, গন্তব্যের আকর্ষণ ফিকে হয়ে মনযিল পানে ছুটে চলা পথযাত্রাটাই বেশি দিলকাশ হয়ে পড়ে। বাস থেকে নামার পরও দীর্ঘ পথ বাকি। গ্রামীণ মেঠো এবড়ো থেবড়ো পাকদণ্ডী। বন-বাদাড় এফোঁড় করে সুদূর পানে চলে গেছে এঁকেবেঁকে। ছোট্ট বিগতযৌবনা একটা খালের পাশ দিয়েও কিছুটা পথ এগিয়েছে। পুরো রাস্তায় একটা দৃশ্যই চোখ কেড়েছে, প্রায় সব বাড়ির উঠোনেই গিন্নিরা বসে বসে নকশী কাঁথা সেলাই করছে। এমনটা আর কোথাও চোখে পড়েনি। অলস বিলাসে সময় নষ্ট করছে না, পরিশ্রম করে দুটো বাড়তি পয়সা ঘরে তুলছে। সংসারের চাকা সচল রাখছে।

***

বিয়েবাড়িতে পৌঁছলাম। দ্বীনি পরিবারের বিয়ে। গান-বাদ্যি নেই। অহেতুক হৈ-হুল্লোড় নেই। তাই বলে আনন্দেরও কমতি নেই। সবাই সাথী জুটিয়ে গল্প-গুজব করছে। ছোটরা বাড়ির ছাদকে খেলার মাঠ বানিয়েছে। আমরাও গিয়ে ছাদের এক কোণে জায়গা করে নিলাম। চারদিকে এত বেশি গাছ, কেমন যেন অন্ধকার হয়ে আছে! কয়েকটা বাঁশ নুয়ে ছাদের উপর এসে পড়েছে। রোদের আলোতেও ছাদটা আরামদায়ক ছায়াদার হয়ে আছে। একটা মাদুর বিছানো ছিল, গা এলিয়ে দিলাম। ঝিরঝিরে মৃদু বাতাস বইছে। সালেহ একটু পরপর এসে এটা সেটা দিয়ে যাচ্ছে। সামান্য বসে যাচ্ছে। আপ্যায়নের কাজ তদারকি করছে।

বাড়ির পাশেই সালেহর স্কুল। স্যারেরা তো বটেই, আশেপাশের সাধারণ লোকজনও জেনে গেছে, সে একজন অসম্ভব মেধাবী আর খেয়ালি। নইলে মাদরাসা-শিক্ষায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের যোগ্যতার অধিকারী হয়েও কেউ নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়! ভর্তি হলেও এভাবে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত ক্লাশ করে? আচ্ছা তাও না হয় মানা গেল, একদম নাইন টেনের টিনেজ ক্লাসমেটদের সঙ্গে কাছা মেরে ফুটবল খেলা? গোল নিয়ে, অফসাইড-পেনাল্টি কিক নিয়ে শিশুসুলভ ঝগড়া করে?

ভাল দিকও ছিল, সে সবাইকে সতর ঢেকে খেলতে নামাতো। নামাযের সময় হলে, খেলা বন্ধ রেখে মসজিদে নিয়ে যেত। আরও আছে, সালেহ অত্যন্ত সুদর্শন! তার হাসিটাও এত সুন্দর আর নিষ্পাপ, ভাল না লাগার কোনো কারণ নেই! সে আজীবন শহরের মাদরাসায় পড়াশোনা করেছে। সে তুলনায় ক্লাসের মেয়েরা অজপাড়াগাঁয়ের। তাদের সঙ্গে এমন গুণী একজন মানুষ পড়লে —হোক না হুজুর— মনে রঙ লাগাই স্বাভাবিক! এমন তুখোড় মেধাবী আর সরল ছেলে পেয়ে সবাই রীতিমতো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সহপাঠিনীদের কথা কী বলব, শিক্ষকরাও কারো মেয়ে, কারো ভাগ্নীর জন্যে মনে মনে পছন্দ করতে শুরু করেছিল! লোফালুফি অবস্থা! আরেক সদ্য পাস করা শিক্ষিকার কথা না বলাই ভালো। বন্ধু বলে নয়, মানুষটা আসলেই সুন্দর! তার উপর এত মেধা আর মনন! পাশ কাটানো মুশকিলই বটে!

***

সালেহ ঢাকায় এলে আমাদেরকে তার বান্ধবী মানে ক্লাসের মেয়েদের নানা কাহিনী সবিস্তারে রসিয়ে রসিয়ে বলত। কিছু নমুনা,

এক. যোহরের নামায পড়তে যাই। বইপত্র বেঞ্চের ওপরই থাকে। প্রতিদিনই দুয়েকটা চিঠি থাকেই! প্রথম প্রথম খুবই আগ্রহ আর মনোযোগ দিয়ে পড়তাম, এখন ইচ্ছা করে না। সবই থোড় বড়ি খাড়া। খাড়া বড়ি থোড়! বিষয়বস্তু আর ভাষায় কোনো উনিশ বিশ নেই।

দুই. চেষ্টা করি ক্লাসের কোনো মেয়ের দিকে না তাকাতে। কিন্তু দুষ্ট মেয়েগুলো এটা টের পেয়ে, নানাভাবে চেষ্টা করে, আমার চোখে পড়তে। শুধু তাই নয়, আমি মনে করতাম শহরের মেয়েরা অতি স্মার্ট, আর গ্রামের মেয়েরা বোকাসোকা, সহজ-সরল! স্কুলে ভর্তি হয়ে ভুল

ভাঙল। গ্রামের মেয়েরা খুব বেশি স্মার্ট না হলেও, দুষ্টবুদ্ধি আর খুনসুটিতে শহরের মেয়েদের চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না! ক্লাসের অতি বিচ্ছু মেয়েগুলো আমার দুই দুই বছরের জীবন ভাজাভাজা করে ছেড়েছে।

তিন. যেখানে খোঁজার কথা ঘুণাক্ষরেও কারো কল্পনায় আসবে না, স্কুলের এমন অসম্ভব অসম্ভব জায়গায়, আমার বইখাতা লুকিয়ে রাখত। দূর থেকে আমার নাজেহাল অবস্থা দেখে চিমটি কেটে হাসতে হাসতে এ-ওর গায়ে ভেঙে পড়ত! ওরা চাইত, আমি ওদের সামনে গিয়ে রাগারাগি করি। কিন্তু তাদের চক্রান্ত আমি তো সফল হতে দিতে পারি না।

চার. আমাকে লুকিয়ে চিঠি লিখে ভালো কথা; কিন্তু নিজেরা আমার নাম দিয়ে ভুয়া চিঠি লিখে, আম্মার কাছে জমা দিয়ে বলে, ‘দেখুন, আপনার হুজুর ছেলের কাণ্ড! সে হুজুর হয়ে আমাদেরকে ‘টিজ’ করে চিঠি লিখেছে!’

আম্মাও যা, কোনটা ছেলের হাতের লেখা, কোনটা অন্যের লেখা— সেটা যাচাই না করেই বিচ্ছুনিদের ফাঁদে পা দিয়ে দেন! আমি ঘরে গেলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলেন,

-তোকে মাদরাসায় পড়িয়ে ভুল করেছিলাম! তোর আব্বু এজন্যই তোকে স্কুলে ভর্তি হতে নিষেধ করেছিলেন। আমি নিষেধ করেছি। তোর মনে বুঝি এই ছিল! শরম লাগে না, একমুখ দাঁড়ি নিয়ে এসব করে বেড়াতে!

আমি মিটিমিটি হাসি। সেটা দেখে আম্মুর রাগ আরও চড়ে যায়! একটু পর রাগ থামার পর, আম্মুর হাত ধরে আমার কামরায় নিয়ে আসি। প্রথমে ঝামটা মেরে হাত সরিয়ে দিতে চাইলেও, আমি জোর করে ধরে নিয়ে আসি। তারপর আমার গোপন কুঠুরি থেকে, নির্দিষ্ট কয়েকটা চিঠি বের করে হাতে তুলে দিয়ে বললাম, দেখুন ভালো করে। হাতের লেখা মিলে কি না!

আম্মু হাতের লেখা মেলাবেন কি, উল্টো গালে হাত দিয়ে গভীর মনোযোগে চিঠি পড়ায় লেগে গেলেন। একটা শেষ করে বললেন,

-আর নেই?

-কয়টা লাগবে আপনার? এবার থেকে চিঠি পেলে আপনাকে দিয়ে দেব।

আম্মু বললেন, ‘কী বোকা, আমি আরও খুশি হয়েছিলাম। বর্তমানে এমন ‘পরহেজগার’ ‘মুত্তাকী’ মেয়েও স্কুলে পড়ে? মেয়েটাকে আবার বেশ পছন্দও হয়ে গিয়েছিল! আরও কত কি ভেবেছিলাম।’

-তোমার কাছে আসার সময় বোরকা পরে এসেছিল না?

-হাঁ, একবারে সব ঢেকে-ঢুকে।

-ওটা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে। অবশ্য এখন স্কুলেও ওরা বোরকা পরে যায়।

-আগে পরত না?

-কয়েকজন পরত। একবার বন্ধুদের বলেছিলাম, বিয়ে করলে বোরকাপরা নামাযী মেয়ে বিয়ে করব! কথাটা এ-কান ও-কান হয়ে মেয়েদের মহলেও পৌঁছে গেছে। তারপর সপ্তাখানেক চলেছে এটা নিয়ে জ্বালাতন! খাতায়, বইয়ে সব জায়গায় দুষ্টগুলো, বোরকা পরা মেয়ের ছবি এঁকে এঁকে লাগিয়ে দিয়েছে। নিচে লিখেছে, সালেহ'স ওয়াইফ! দুষ্টুমি করলেও, কয়েকজন বোরকা পরে স্কুলে আসা শুরু করেছে।

-বাপরে, স্কুলের মেয়েগুলো এত দুষ্টুমি করে!

-আপনাকে ওদের সব দুষ্টুমির কথা বললে, হার্টফেল করবেন। আপনার ওসব শুনে কাজ নেই। এদিকে হয়েছে আরেক জ্বালা!

-কী হয়েছে?

-মেয়েরা সব আমাকে নিয়ে দুষ্টুমি করে। অন্য ছেলেদের সঙ্গে কিছু করে না। এটা নিয়ে ছেলেদের বেজায় উষ্মা! আমার প্রতি তারা মহাখাপ্পা! তাদের একটাই প্রশ্ন, তুই তাদের সঙ্গে কথা বলিস না, তাদের দিকে ফিরেও তাকাস না, তবুও তোকে নিয়ে তারা এত ব্যস্ত কেন? অথচ আমরা তাদের জন্যে কী না করছি! নিজের হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে কত কী যে কিনে দিচ্ছি! ক্লাসের বই কিনে দিচ্ছি, যখন যা হাতের সামনে পাই, এনে দিচ্ছি। গাপুস-গুপুস করে খেয়েই আবার তোর দিকে ছোটে! কী তাবিজ করেছিস রে! ভাই, দে না, আমাদের একটা করে! তুই 'এতগুলো' দিয়ে কী করবি?

আম্মুকে এ-ও বললাম,

-আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার কাছে আরও চিঠি আসবে! সেটা নিয়ে আসবে অন্য মেয়ে! তাদেরকে কিছু বুঝতে দেবেন না! দেখি, তারা কতদিন এই লুকোচুরি খেলতে পারে!

-এবার থেকে তোর খাতাপত্রে কেউ চিঠি রাখলে সেটা না পড়ে সোজা আমার হাতে দিবি।

* * *

বিয়েতে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা দাওয়াত পেয়েছে। বাড়িতে কিচির-মিচির করছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে দপ্তরি পর্যন্ত কব্জি ডুবিয়ে খেয়ে গেলেন। সালেহ আমাদের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিল। খেলার সাথী আর পড়ার সাথী সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বুঝতে পারলাম, সবাই সালেহকে খুব পছন্দ করার পাশাপাশি শ্রদ্ধাও করে। বড় একটা রুমে আমাদের পরিচয়পর্ব সারা হচ্ছিল। ভেতর থেকে মেয়েদের কল-কাকলি ভেসে আসছিল। পর্দার ওপাশ থেকে মিহি স্বর ভেসে এল,
-শুধু বন্ধুদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলে হবে, বান্ধবীরা কেন বাদ পড়বে?
সালেহের এক বন্ধু উঠে পর্দার দিকে দৌড়ে যাবার ভান করে ভেচকি দিল। ওপাশে হুড়মুড় করে একে অপরের উপর পড়ার আওয়াজ ভেসে এল। হি হি, হু হু থামছেই না। দুষ্টুমির তীর যে শুধু সালেহের দিকেই আসছিল তা নয়, 'অন্যরাও' কমবেশ শরাহত হল।

***

বিচ্ছু মেয়েগুলো সালেহর মাকে বাগাতে না পেরে, বেচারার নিরীহ আর অসম্ভব ভালো অল্পবয়েসী বউটাকে নিয়ে পড়ল। সেই পুরনো কৌশল! গাদা গাদা চিঠি দেখিয়ে বলল,
-ভাবী, এগুলো সব তোমার জামাই লিখেছে আমাদেরকে!
বউ এসব দেখে কাঁদতে শুরু করে দিল। তাকে শান্ত করতে, মেয়ের বাবাকে অন্দরে আসতে হলো। পরে অবশ্য স্কুলের সহপাঠিনীরা বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। স্কুল ছুটির পর, দলবেঁধে 'ভাবীর' সঙ্গে গল্প করতে আসত। আম-করমচার আচার বানিয়ে খেত! শুধু এক বান্ধবী বে-পরোয়া হয়ে ভাবীকে সতীন হওয়ারও প্রস্তাব দিয়ে বসেছিল। দুষ্টুমি করে নয়, সত্যি সত্যিকারের সতিন! সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড!

***

শুনেছিলাম সালেহর শ্বশুর বড় আলেম। বুখারী শরীফ পড়ান। তিনি এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। একটু ফাঁক পেয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। নিজ থেকেই । হয়তো বাজিয়ে নিতে চাইলেন, মেয়ে জামাইর আসল বন্ধুরা কেমন! জামাই কাদের সঙ্গে ওঠাবসা করে! খুবই বিনয়ের সঙ্গে মুসাফাহা করলেন। কথায় কথায় জানতে পারলাম, তিনি জামেয়া পটিয়ার মহাপরিচালক, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সম্মানিত উস্তাদ আল্লামা আবদুল হালীম বুখারী দা.বা.-এর কাছে পড়েছেন। বুখারী সাহেব হুজুর

পটিয়াতে শিক্ষকতা করার আগে টাঙ্গাইলের এক মাদরাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। সেখানেই শ্বশুর সাহেব আমাদের হুজুরের কাছে পড়েছেন। তিনি সহাস্যে বলে উঠলেন,

-তাহলে তো আমরা ছাত্রভাই হয়ে গেলাম।

এরপর গল্প জমে উঠতে সময় লাগল না। বরাবরই আমাদের একটা কৌতূহল ছিল। আর চেপে রাখতে পারলাম না।

-সালেহর কাছে কেন মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি হলেন? চাকরি নেই। বাবার আশ্রয়ে থাকে। সবে এসএসসি দেবে! বয়েস কম! খেয়ালি! অনিশ্চিত ভবিষ্যত! মেয়ের বাবা হিশেবে, এমন চালচুলোহীন মানুষকে পাত্র নির্বাচন করার কথা নয়?

-(স্মিত হেসে) প্রথম কথা হলো, আমার কাছে প্রস্তাব গিয়েছিল, একজন অল্পবয়েসী মাওলানা, স্কুলে পড়ে। এখন সে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিয়ে করার বায়না ধরেছে বাবা-মায়ের কাছে। ব্যাপারটা এক বিবেচনায় ব্যতিক্রমই বলা যায়। ছেলে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিয়ের বায়না ধরেছে, বাবা-মাও রাজি হয়ে বউ খুঁজতে বের হয়েছে, বিরল ঘটনাই বটে। প্রস্তাব শুনে, আমি একটা শর্ত দিয়েছিলাম।

-কী শর্ত!

-আমি একবার ছেলেটার সঙ্গে একাকী কথা বলতে চাই।

ব্যবস্থা হলো। সালেহকে দেখেই আমার ভালো লেগে গেল। ভদ্র। গভীর ইলমের অধিকারী। বাকী দশজন আলেমের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণেই মুত্তাকী। সমস্যা একটাই, সে শিশুসুলভ সরল। তা হোক, আমার মেয়েটাও ছোট! সুবোধ! শান্তশিষ্ট! বিয়ের উপযুক্ত হলেও এখনো স্বামীর ঘর করার মত পোক্ত হয়ে ওঠেনি। মেয়ের মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। মায়ের মনে নানা চিন্তা উঁকি দিল। তাকে বুঝিয়ে বললাম। মেনে নিল। তারপর আর কি! বিয়ে হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ, এখন পর্যন্ত অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি।

***

সালেহ ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেও, নিয়মিত যোগাযোগ হত। তার সমস্যার কথা বলত। তাকওয়া বজায় রেখে স্কুলে পড়া চালিয়ে যাওয়া কঠিন! আমরাই দুষ্টুমি করে বলতাম,

-তাহলে বিয়ে করে ফেলো।

বোকাটা দুষ্টুমি ধরতে পারল না। অথবা ধরতে পারলেও, প্রস্তাবটা পছন্দ হয়ে যাওয়াতে সে আগ্রহের সাথে বলল,

-সত্যি বলছেন? বিয়ে করলে, সমস্যার সমাধান পাব?

-কেন পাবে না!

-বাড়িতে কিভাবে বলব?

এসব ক্ষেত্রে যা হয় আরকি, বিয়ের আগে দুষ্টবন্ধুরা তাদের উদ্ভাবনী শক্তি ব্যয় করে নানা উপায় বের করে।

(ক) নিয়মিত রাতে গোসল করা শুরু করবি। ভেজা লুঙ্গি সবাইকে দেখিয়ে মেলে দিবি।

(খ) রাতে গভীর ঘুমের ভান করে, জোরে জোরে মেয়েদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করবি।

(গ) মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কয়েকদিন মনমরা ভাব নিয়ে থাকবি। কেউ প্রশ্ন করলেও উত্তর দিবি না। দুয়েকবার বলতে পারিস, কিছু ভালো লাগে না।

(ঘ) রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, চিৎকার করে বলতে থাকবি, আমি আর পারছি না। আর সহ্য করতে পারছি না। হে আল্লাহ, আমাকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচাও।

(ঙ) একটা করাত নিয়ে, রাতের বেলা শোয়ার চৌকি সমান মধ্যখান বরাবর কাটতে শুরু করবি।

-ও খোকা, কী করছিস!

-পালঙ্কটা কেটে ফেলছি।

-কেন কেন!

-একা মানুষ, এত বড় খাটে শুতে ভাল লাগে না। ঘুম আসে না।

(চ) মাঝে মধ্যে ঘর ছেড়ে কোথাও চলে যাবি। বলবি, বাড়িঘর আর ভাল লাগছে না। রাতে ফিরতে দেরি করবি। বলবি, ঘরে ফিরে কী করব? ঘরে আছেটা কি!

***

সালেহকেও এসব টিপস দেয়া হয়েছিল। সে কোনটা প্রয়োগ করেছিল, আল্লাহই জানেন। সে প্রচলিত সমাজে অসম্ভব একটা 'স্কিম' সফল করে

তুলেছে। বিয়েটা যে সুখের হয়েছে, সেটা তার কথাবার্তাতেই ফুটে উঠত। জীবনের ব্যস্ততা বন্ধুত্বে চিড় ধরিয়ে ফেলে। সে তার পড়াশোনা আর 'পুতুল বউ' নিয়ে আকণ্ঠ ডুবে গেল। আমরা যে যার কাজে! দীর্ঘদিন খোঁজ-খবর নেই! হঠাৎ এক গভীর রাতে, অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন! ধরার কথা নয়, তবুও ধরে ফেললাম।

-আরে, সালেহ?

ওপাশ থেকে হাউমাউ করে কান্নার শব্দ ভেসে এল। কাঁদছে তো কাঁদছেই। থামেই না। পাশ থেকে আরেকজনের কান্নার আওয়াজও আসছিল।

গভীর রাতে আচানক এমন ফোন পেলে যে কেউ বিচলিত হয়ে উঠবে। যতই তাকে থামতে বলি, কান্না আরও বেড়ে যায়।

-কী হলো, কাঁদছিস কেন!

-আমার সব শেষ হয়ে গেছে! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

-কী হয়েছে? খুলে না বললে, বুঝব কী করে?

-আমার সঙ্গে 'ওর' ঝগড়া হয়েছে!

-সে তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়েই থাকে! আর রাতের ঝগড়ার পরিণতি বেশির ভাগই অত্যন্ত 'মধুর' হয়!

-না, সে-রকম কিছু নয়। গত কিছুদিন ধরেই ওর সঙ্গে একটা বিষয়ে মনোমালিন্য হয়ে আসছিল। সাক্ষাতে বিস্তারিত বলব।

-এখন তাহলে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়।

-আমরা যে আর একসঙ্গে থাকতে পারব না।

-মানে, বলছিস কী তুই! ওর সঙ্গে আর ঘর করবি না, বলছিস?

-ওর সঙ্গে আর ঘর করতে পারব না, এটা ভেবেই তো কান্না আসছে। রাগের মাথায় আমার মুখ দিয়ে কিছু শব্দ বেরিয়ে গেছে।

-আচ্ছা, রাতটা কাটুক। সকালে বোধ হয়, সম্ভব হবে না। বিকেলে তোর সঙ্গে কথা বলব! তুই তাকে ঠিক কী বলেছিস, সেটা পরিষ্কার করে বলিস। আমি মুফতী সাহেব থেকে ফতোয়া নিয়ে তোকে জানাব।

***

সালেহ সে রাতের বাকি সময়টুকু বাড়ির ছাদে কাটিয়েছে। নির্ঘুম ছটফট করতে করতে। আফসোস আর হাহুতাশে। রাগের মাথায় ক্ষণিকের জন্য

আত্মনিয়ন্ত্রণ হারালেও, সম্বিত ফিরে পেতে দেরি হয়নি। ফতোয়া আসতে সময় লাগবে। ফতোয়া যদি 'তালাকের' পক্ষে আসে, তাহলে একসঙ্গে থাকা 'হারাম'। দেখা দেওয়া হারাম।

রাতের বেলায় কেউ টের পায়নি। কিন্তু দিনের বেলা? কতক্ষণ লুকোচুরি করে থাকা যাবে? ফজর পড়ে মসজিদেই শুয়ে পড়ল সালেহ। এশরাক পড়ে আল্লাহর কাছে হাউমাউ করে কেঁদে ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইল। দুটো বাচ্চাসহ এ-অসহায় মানুষটার এখন কী হবে! এর সমাধানই-বা কী? মানুষটাকে ছাড়া জীবন চালানোই মুশকিল। কিন্তু মুহূর্তের রাগে কী থেকে কী হয়ে গেল! সালেহ কাউকে কিছু না বলে একবস্ত্রে ঢাকা চলে এল। দেখা হওয়ার পর জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না! আবেগী মানুষ!

-থাম থাম, কী হয়েছে সব খুলে বল। একদম গোড়া থেকে! সব সমস্যারই একটা সমাধান আছে।

-খুলে বলার কিছু নেই। রাগের মাথায় তাকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছি! তারপর এখন আমার কী করণীয় সেটা বলে দিন।

-করণীয় আর কিছু নেই। আমি মুফতী সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি! স্ত্রীকে তিন 'হায়েজ' ইদ্দত পালন করতে হবে।

-তারপর?

-আগে ইদ্দত শেষ হোক! তখন করণীয় ভেবেচিন্তে ঠিক করে নেয়া যাবে!

-সে তো প্রায় তিন মাসেরও বেশি! এতদিন তাকে ছাড়া আমি থাকব কী করে? আমার বাচ্চাদুটোর কী হবে? তারা আমাকে ছাড়া থাকবে কী করে?

-যা হওয়ার হয়ে গেছে, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘটনার লাগাম আমাদের হাতে নেই। শরীয়তের বিধান মেনে নিতেই হবে! কিন্তু একটা ব্যাপার আমাকে খোলাসা কর, তুই বুঝের মানুষ হয়েও এমন ভুল কিভাবে করলি?

-সারাক্ষণ খোঁচাখুঁচি করলে, একজন সুস্থ মানুষও পাগল হয়ে যেতে বেশি সময় লাগে না। বিয়ের দিন একটা কথা বলেছিলাম, মনে আছে কি না জানি না। কাবিননামায় একটা ধারা আছে, স্ত্রীর হাতে তালাকের অধিকার থাকা-না থাকা নিয়ে। শ্বশুরপক্ষ চেয়েছিল, স্ত্রীর হাতে অধিকার থাকুক। সেমতেই কাবিনের ঘরগুলো পূরণ করা হয়েছিল। শুধু আমার স্বাক্ষর করা বাকি। আব্বাও বিষয়টা খেয়াল করেননি। কী মনে হতেই আমি পুরো কাবিননামা একবার পড়ে দেখলাম। তখন বিষয়টা চোখে পড়ল, মেয়েকে

তালাকের অধিকার দেয়া হয়েছে। আমার শ্বশুরেরও এ-ব্যাপারে সায় আছে দেখা গেল। আমি অবাক, তিনি কি বুঝতে পারছেন না, মেয়েদের হাতে তালাকের অধিকার দেওয়ার মানে কি? নির্ঘাত বিয়ে ভাঙবে। সামান্য মন কষাকষি হলেই সে তার অধিকার প্রয়োগ করবে! একজন অভিজ্ঞ আলিম হয়ে তার এই ভীমরতি হলো কী করে? নাকি মেয়ের স্নেহে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন? আমি শক্ত করে বললাম, মেয়ের হাতে তালাকের অধিকার দেওয়া যাবে না। কেটে দিয়ে নতুন করে লিখুন। মেয়ে আমার সঙ্গে ঘর করতে না চাইলে, তখন আমি ধরে রাখব না; কিন্তু কাগজে কলমে তাকে স্থায়ীভাবে এমন ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া যৌক্তিক হবে না। এমনিতেই তার বয়েস কম, তার উপর মেয়েরা রাগের মাথায় চট করে সিদ্ধান্তে এসে যায়। বিশেষ করে স্বামী-সংসার বিষয়ে। অনেক ফিরিশতাতুল্য স্বামীও সামান্য ভুলের দরুন স্ত্রীর কাছে অপাক্তেয় হয়ে যায়। সব গুণ ছাপিয়ে স্ত্রীর দৃষ্টিতে সে স্বামী হয়ে পড়ে,

-'তুমি আমার জন্যে কিছুই করনি। তোমার কাছে আমার কোনো মূল্যই নেই। তোমার কাছে আমি কিছুই পাইনি।' খোদ হাদীস শরীফেই এমন একটা কথা আছে।

***

সালেহ বলল,

বিয়ের পর আমাদের জীবন খুব সুন্দরভাবেই কাটছিল। যেভাবে সবার কাটে। সময়ের সাথে সাথে প্রাথমিক মোহ কেটে গেল। ঘোরও একসময় চলে গেল। আস্তে আস্তে বাস্তবতা সামনে আসতে শুরু করল। আব্বু ছেলেকে বিয়ে করিয়ে দিয়েছেন। আগের মত পকেটখরচাও দিয়ে যাচ্ছেন। আগে যা দিতেন, এখনও তা। মানুষ যে একজন বেড়েছে, সেটার কথা আব্বুর সবসময় খেয়াল থাকে না। বিবির জন্যে টুকিটাকি কিনতে হয়। বাচ্চাদের খেলনা-দোলনা প্রয়োজন হয়। হাতে সবসময় টাকা থাকে না। ছোটখাটো অভাব অপূর্ণতা থেকে তৈরি হয় অভিযোগ। জমে জমে পুঞ্জীভূত হয়। ক্রমে ক্রমে সেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে নানা আঙ্গিকে। কানের কাছে এসব প্যানপ্যান বাজতে থাকলে, একদিন দুদিন তিনদিন, চতুর্থদিন আর সহ্য করা যায় না। অক্ষম আক্রোশ ফেটে বের হয়ে যায়। অপরপক্ষকে তখন একটু সমঝে কথা বলতে হয়। কিন্তু ওপক্ষও যদি

আগুনে ঘি ঢালতে উৎসাহী হয় তাহলে বিপদ ঘনাতে বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। দীর্ঘদিন সহ্য করতে করতে, সে রাতে আর পেরে উঠিনি। শরীরটা খারাপ ছিল। মনটা নানা কারণে দুর্বল ছিল। তাকে বেশ কিছুদিন ধরে কঠিনভাবে সতর্ক করে আসছিলাম। সেও অবুঝের মত, আমার নরম জায়গা ধরে খোঁচা দিয়ে মজা পেত যেন। তাকে হাজারবার বলেছি, আর যাই কর, আমার কাছে তালাক চাইবে না। বিচ্ছেদ চেয়ে পীড়াপীড়ি করবে না। এটা খেলা নয়। হাসি-মশকারার বিষয় নয়। সে শুনলে তো! সে ভেবেছিল, আমি তার প্রতি এতই দুর্বল, বিচ্ছেদ চাইলে আমি কাবু হয়ে পড়ব। আমাকে ফাঁদে ফেলার অব্যর্থ কৌশল সে যখন-তখন কাজে লাগাতে চাইত। বোকা মেয়েটা বুঝতেও চাইত না, সে আগুন নিয়ে খেলা করছে। সেই রাতেও অতিতুচ্ছ একটা বিষয় নিয়ে সে সন্ধ্যা থেকেই ঘ্যানঘ্যান শুরু করল। তার চাওয়ার বিষয়টা এমন, সেটা না হলে বা না পেলে, কোনোও সমস্যা হবে না। তার মৌলিক চাহিদাগুলোর কোনোটাই কখনও অপূর্ণ থাকেনি। সেটা জৈবিক হোক বা আত্মিক! কিন্তু সে নিজেকে বিবেচনা করত আশপাশ দেখে। তার এটা মাথায় থাকত না, তার স্বামী একজন ছাত্র। তদুপরি ছাত্র হলেও, বহু চাকুরিজীবীর বউয়ের চেয়েও সে অনেক বেশি সুখে ও সম্মানে, আদরে-সোহাগে ছিল।

বহু চেষ্টা করলাম বোঝাতে। না, তার এক কথা, আমার চাহিদা পূরণ করতে না পারলে আমাকে ছেড়ে দাও। আমার বিয়ে ঠেকে থাকবে না!

-আসলেই কি তাই, তার বিয়ে ঠেকে থাকবে না? এতই গুণবতী বা রূপবতী?

-আরে নাহ, সেটা তার কল্পনাবিলাস! সে নিজেও জানে না, সে কতটা অসহায়! আমিও বুঝতে দিই না। এখন মনে হচ্ছে, তাকে বুঝতে না দেওয়াটা ভুল ছিল। তার ঘোর ভেঙে দেওয়া দরকার ছিল! কিন্তু তাহলে যে তার 'মনের বল' বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। সে নিজেকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মূল্যবান মনে করত। আমি তাকে অবহেলা করলে, সে তখন হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করত। আমি সেটা চাইনি। আমি চেয়েছিলাম, সেও আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে আমার সঙ্গে ঘর করুক। আমাদের সন্তানের মা একজন মেরুদণ্ডহীন হোক— সেটা আমি চাইনি। কিন্তু সে বাস করত এক কল্পিত ঘেরাটোপে! আমার যুক্তিতর্কের ধাক্কা তাকে স্পর্শ করত বলে মনে হয় না। আমার শাশুড়িকেও জানিয়েছিলাম,

তার এই 'সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স'-এর কথা! মা তাকে অনেক বকাবকিও করেছিলেন। এই অন্ধবিশ্বাস থেকে তাকে মুক্ত করে আনতে চেয়েছিলেন! কিন্তু কে শোনে কার কথা! সে যখন যখন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কেও টেনে 'তালাক' পর্যন্ত নিয়ে যেত! বুঝতে পারাম, তার বয়েস কম হওয়ার কারণে সে বাস্তবতার রূঢ়তা বুঝতে পারত না। তাই আমি তার শত অন্যায় আচরণকেও ভালবাসা দিয়ে বদলে দিতে সচেষ্ট থাকতাম! পারতপক্ষে এসব নিয়ে মাথা ঘামতে চাইতাম না। সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করতাম, আমি একজন আলিম হিশেবে, স্ত্রীর প্রতি আমার করণীয় কর্তব্য আদায় করছি তো? নবীজির আদর্শের উপর থাকছি তো? আমার মধ্যেও অনেক দুর্বলতা ছিল, কমতি ছিল, ঘাটতি ছিল। এসব নিয়েই আমি চেষ্টা করেছি, তার 'হক' আদায়ের। আমার শত আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল হত উল্টো! সে মনে করত, আমি তাকে ছাড়া একদম অচল! তাই সে আচার-আচরণে আরও বেশি হিংস্র আর নির্দয় হয়ে উঠত!

যাক, সে রাতে তার বাড়াবাড়িটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আমিও তাল সামলাতে পারিনি। সে যা চেয়েছে, তাই উচ্চারণ করে দিয়েছি। সে বলেছে আমাকে তালাক দিয়ে দাও! আমি রাগের মাথায় তার কথায় সায় দিয়ে ফেলেছি! সেটাই ছিল আমার চরম ভুল। যার খেসারত আমাকে এখন দিতে হবে! আমি কী যে করব! কিছুই ভেবে কূল-কিনারা করে উঠতে পারছি না। আমার যা হোক একটা কিছু হয়ে যাবে, কিন্তু ওই অসহায় মানুষটা পড়বে অকূলপাথারে! আমি 'শব্দগুলো' উচ্চারণ করার সাথে সাথে, তার চেহারায় যে অবিশ্বাস ফুটে উঠতে দেখেছি, সেটাই আমার ভেতরটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সে বোধহয় ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি, আমি এতটা নির্মম হতে পারি! কিন্তু অনবরত এভাবে উস্কানি দিতে থাকলে, পৃথিবীর সবচেয়ে নিরীহ মানুষটাও সহিংস হয়ে উঠতে বাধ্য।

* * *

সালেহকে বহু সান্ত্বনা দিয়ে কোনো রকমে শান্ত করা গেল। এখন প্রশ্ন দেখা দিল, ইদ্দতের মেয়াদ, আগামী সাড়ে তিন মাসের মত সময় কী করবে! অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিন চিল্লার জন্য বের হল। ওদিকে আরেকজনের অবস্থা রীতিমত পাগলপারা। কারো কাছে খুলে বলবে, সমাধান চাইবে, সে উপায় নেই। ছোট ছোট দুটো সন্তান। তাকে শুধ

মেসেজে জানানো হলো, সবর কর। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যে মানুষ নিজের বোকামির কারণে, এতবড় বিপদ ডেকে আনল, সে কি সামান্য মেসেজে ভুলতে পারে! সবর করতে পারে! কিন্তু না করে উপায়ই-বা কি!

***

সালেহ তাবলীগে গিয়ে এররকম বেঁচেই গেল বলা যায়। একপ্রকার ব্যস্ততার মধ্য দিয়েই সময় কেটে যাচ্ছে। নানা ঘটনা, চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে ইদ্দত শেষ হলো। তিন চিল্লাও শেষ! এবার? কঠিন নির্মম সত্যের মুখোমুখি হতে হবে! কাকরাইলে সব কাজ শেষ করে রুখসত হলো। শুরু হলো এখনকার করণীয় নিয়ে একে একে বিভিন্ন মুফতি সাহেবের সাথে মত বিনিময়। বিষয়টা এমন সবার কাছে সবকিছু খুলে বলাও যায় না, আবার না বললে সঠিক মাসআলাও পাওয়া যায় না। মোটামুটি সবাই একটা কথা বললেন,

-আবার আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে হতে হবে। দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে তালাক দিলে, তখন প্রথম স্বামী বিয়ে করতে পারবে। তাছাড়া দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিয়েটা হতে হবে পরিপূর্ণ। কোনোরকমের শর্ত-শরায়েত ছাড়া। বর-কনে কারো মনে বিন্দুমাত্র ভিন্ন কোনো ইচ্ছা থাকবে না। বিয়েটা একরাতের জন্যে হতে হবে, এ-ধরনের গোপন চুক্তি থাকতে পারবে না। এ-বিয়ের জন্যে যেচে কাউকে প্রস্তাবও দেয়া যাবে না।

-তাহলে সমাধান হবে কী করে?

-সমাধান না হওয়াটাই ভালো! এতই সমাধানপন্থী হলে, তালাক দেয়ার সময় খেয়াল ছিল না? এ-ধরনের হালালী বিয়েকারীকে নবীজি লানত করে গেছেন।

-বিষয়টা এতই অপছন্দ হলে, কুরআনে এটাকে বৈধ দেয়া হয়েছে কেন?

-বৈধতা দেয়া হয়েছে, মানুষের প্রয়োজনের কথা ভেবে। আর হিল্লা বিয়েকে কুরআনে বৈধতা দেওয়া হয়নি। কুরআন কারীমে আছে, তালাক দেয়া স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে হলে, তাকে আরেক স্বামী স্বাভাবিক পন্থায় বিয়ে করতে হবে। গোপন চুক্তি, বিভিন্ন শর্তারোপের কথা কুরআন কারীমে নেই।

-এখন এত কথা বলে কী হবে? আমাদের কী হবে?

-একজন লোক খুঁজে বের করতে হবে। যিনি মাসআলা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল! তার কাছে আমরা শুধু পরিস্থিতিটা তুলে ধরব। কোনো

প্রস্তাব দেয়া যাবে না! অতিরিক্ত কিছু বলাও যাবে না। মুখে মুখেও না, ইশারা-ইঙ্গিতেও না। তিনি হালত বুঝে নিয়ে, নিজ থেকে বিয়ে করতে আগ্রহী হলে, সমাধান বেরিয়ে আসতে পারে!

-তিনি যদি তালাক না দেন?

-সেক্ষেত্রে কিছুই করার নেই! তালাক দেয়ার জন্যে বিয়ে করলে, বিয়েটাই বৈধ হবে না। এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে।

***

শুরু হল নতুন মেহনত। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজনের সূত্রে সংবাদ পাওয়া গেল, একজনকে বলা যেতে পারে। তিনি সম্মত হলেও হতে পারেন। খুবই সাবধানতার সঙ্গে তার কাছে কথাটা পাড়তে হবে। জটিল সঙ্গিন পরিস্থিতির কথা কৌশলে তুলে ধরতে হবে। সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি মাসআলার সবদিক সম্পর্কে সম্যক অবগত! তৃতীয় আরেক পক্ষকে দিয়ে যথাস্থানে বক্তব্য যথাযথ হিকমতের সঙ্গে উপস্থাপন করা হল। তিনি স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় ব্যাপারটা ধরে ফেললেন। বিয়ে করতে সম্মত হলেন। নতুন সমস্যা দেখা দিল, বিয়েটা কোথায় হবে? উভয় পক্ষই এমন বেদনাদায়ক ও লজ্জাজনক বিষয়টাকে গোপন রাখতে চায়! এ-সমস্যারও সমাধান হল, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে! নতুন প্রশ্ন উঠল, পাত্রীকে কে নিয়ে যাবে? সালেহ বলল,

-সে এখন আমার জন্য বেগানা নারী! গুনাহ হওয়ার ভয়ে আমি তার সঙ্গে ফোনেও কথা বলি না। অতি প্রয়োজন হলে, মেসেজ দিই। তাও শুধু বাচ্চাদের প্রয়োজনে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়।

-রাখ্ তোর অতি সুফিবাদী মনোভাব! এতই যখন তুই মুত্তাকী, তাহলে বউয়ের সামান্য উস্কানিতেই তালাক দিতে গেলি কোন সুখে? মুত্তাকী মানে কি, সিজদা দিয়ে দিয়ে কপাল ফুটো করে ফেলা? নাকি রাগ দমন করাও তাকওয়ার আওতায় পড়ে? বিবির রাগ-ক্রোধ হজম করাও কি তাকওয়ার সীমায় পড়ে না? যা বলছি শোন্, একটা সিএনজি ভাড়া করবি। তুই সামনের আসনে বসবি! ভাবীকে পেছনে একা বসিয়ে দিবি। পেছনের দিকে চোখ না গেলেই হলো। এ-ছাড়া গোপনীয়তা রক্ষা করে, কাজটা সমাধা করা সম্ভব নয়।

***

বিয়ে পড়িয়ে দেয়া হলো। বিবিকে তৃতীয় এক বন্ধুর বাড়িতে তুলে দিয়ে আমরা চলে এলাম। পাশের এক পরিচিত স্থানে রাতটা কাটাবো। সালেহ কিছু মুখে দিল না। সারাদিন, সারারাত একটানা তিলাওয়াত-সালাত আর তাসবীহে কাটিয়ে দিল। রাতেও এক ফোঁটা ঘুমায়নি। শুধু মুনাজাত ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে! শেষরাতের দিকে ও গোঙাতে গোঙাতে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে হাত ব্যথা হয়ে গেল আমাদের। চেতনা ফেরে না কিছুতেই। ফজরের আজানের পর তার হুঁশ ফিরল। অনেক জোর করেও তাকে কিছু খাওয়াতে পারলাম না। আমাদের মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কোনো কথাই হচ্ছিল না। আসলে কেউ কোনো কথাই বলছিল না। সময়গুলো অসহ্য রকমের গুমোট হয়ে ছিল। কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছিলাম না। সবার মনেই এক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল; কিন্তু কেউ মুখ ফুটে বলছিল না। এভাবে সাতটা বাজল। নয়টা বাজল। দশটা বাজল। ওদিক থেকে কোনো সংবাদ এল না। যোহরের আযান হলো। নামাযও শেষ হল একসময়। সালেহ চুপচাপ! সেই গতকালের মত। নামাজ পড়ছে! দু'আ করছে! হেঁচকি তুলে তুলে কাঁদছে! নীরবে!

একরাতেই ওর অপূর্ব সুন্দর চেহারাটা কেমন বিষাদক্লিষ্ট হয়ে গেছে! গালদুটি ভেঙে তোবড়ানো হয়ে গেছে! চোখদুটো গর্তে ঢুকে গেছে। চোখের নিচে গাঢ় কালি জমে বিকট আকৃতি ধারণ করেছে। এটা কী? 'গায়রত'? আত্মমর্যাদাবোধ? তাকে পরে প্রশ্ন করেছিলাম,

-তোর কেমন লেগেছিল সে রাতে?

-মাথাটা পুরোপুরি ফাঁকা ছিল। একটা কথাই বারবার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, আমি আমার রবের ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট! আর শুধু মনে হচ্ছিল, 'ওকে' আর স্ত্রী হিশেবে পাব না।

-কেন? তোর এমনটা মনে হওয়ার কারণ?

-তাকে যে লোক কাছ থেকে দেখবে, প্রথমেই তার স্বভাবজাত বোকামিগুলো চোখে পড়বে না। প্রথমে চোখে পড়বে তার সারল্যমাখা চাহনি! তার নিষ্পাপ ভীরু ভীরু আচরণ! অন্যরকম হাসি! এটা যে কাউকেই বিবশ করে ফেলবে, আর... আর... ওর মধ্যে এমন কিছু আছে, যা একজন স্বামীকে মুগ্ধ করার জন্যে যথেষ্টর চেয়েও অনেক বেশি।

-এতই যখন ডুবে ছিলি, মুখটা সামলে রাখতে পারলি না কেন?

-ভাই রে, তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই তো আজ দুদিন ধরে অভুক্ত হয়ে পাগলের মতো পড়ে আছি। বেশি কষ্টে ফেলে দিয়েছে, তার চিঠিটা!

-কোন চিঠি? সেটার কথা আগে বলিসনি তো?

-আমি তাকে সিএনজি করে নিয়ে এলাম না? গন্তব্যে পৌঁছে নামার সময় ও আমার জামার পেছনে গলার ফাঁকে একটা চিঠি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমি অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করেছি। খুলিনি। পরে খুলেছি। সে অনেক কথা লিখেছিল। অন্যদেরকে বলার মত ছিল,

> "আজ পাঁচদিন ধরে ভাত খাইনি। আমি না
> থাকলে, বাচ্চাগুলোকে দেখেশুনে রাখবেন।
> ভাল দেখে একটা বিয়ে করবেন।"

মেয়েটা এমন হালতেও রসিকতা ছাড়তে পারেনি। তার এ-অবস্থায় আমি খাই কী করে?

* * *

বিকেল তখন তিনটা! আমরা আর অপেক্ষা করব না বলে প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আর দেরি করলে, ফেরার গাড়ি পাব না। সালেহ তো প্রায় মুমূর্ষু। মারা যাওয়ার ঠিক যেন আগের ধাপে! তাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এলাম। সে বিড়বিড় করে শুধু বলছিল,

-(أُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللهِ) আমার বিষয়টা আমি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলাম! বারবার এই আয়াতটুকু পড়ছিল। ডুকরে কেঁদে উঠছিল। সান্ত্বনা দেব কি, আমাদের চোখও বাধা মানছিল না। স্টেশনে গিয়ে নির্দিষ্ট নম্বরে একটা মেসেজ পাঠালাম।

-আমরা 'সবাই' চলে যাচ্ছি।

গাড়িতে উঠতে যাব, ফোন বেজে উঠল। কাঙ্ক্ষিত নম্বর। সালেহ ভীষণ ব্যগ্র হয়ে ফোনের দিকে তাকালো। আমাদের মধ্যস্থতাকারী বন্ধু ফোন রিসিভ করল। আমরা তার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছি! পৃথিবীর সমস্ত মনোযোগ একত্র করে! লক্ষ্য করছি, তার মুখাবয়ব! দীর্ঘ সময় ধরে কথা হলো! ওপাশ থেকে কী বলা হলো জানি না, এপাশ থেকে চুপচাপ শুনে গেল! অনেকক্ষণ পর, তার চেহারায় হাসি ফুটে উঠতে দেখে, আমাদের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। ফোনটা নামিয়েই সে সালেহকে জড়িয়ে ধরে

কাঁদতে শুরু করল। সালেহ গাড়ির সিটের উপরেই সিজদায় পড়ে গেল! তার পিঠের ওঠানামা দেখে বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল, তার কান্না বাঁধ মানছে না! গাড়িতে যাত্রী ছিল না। শুধু আমরা ক'জন।

***

তারা দুজন সিএনজি করে চলে গেল। সঙ্গে আরেকজন মহিলাও এসেছিলেন। তিনি ভাবীকে ধরে ধরে গাড়িতে ওঠালেন। তিনিও সঙ্গে উঠলেন। ভাবী তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। অবস্থা শোচনীয়। মুমূর্ষু! আমাদের মনটা মায়ায়, শ্রদ্ধায় কানায় কানায় ভরে উঠল। সালেহকে শুধু বলতে পারলাম,

-এই মহীয়সী মানুষটা তোমাকে ভালোবেসে যা করলেন, তুমি বাকি জীবন তার প্রতিদান দিয়েও শোধ করতে পারবে না।

-আমি তার কেনা দাস হয়ে থাকব।

-দাস হওয়ার দরকার নেই! শুধু সত্যিকারের স্বামী হয়ে থেকো! তাহলেই হবে! একটু সবর-ধৈর্য্য রেখো! বিবির কথায় ফাঁৎ করে জ্বলে উঠতে যেয়ো না! বউরা রাগের মাথায় কত কিছু বলে, সব শুনতে নেই।

***

ইদ্দত শেষ হলো। আবার যেতে হলো। বিয়ে পড়ানোর জন্যে। বাড়িতে বলা হলো, আমরা বেড়াতে এসেছি। বেড়ানো না ছাই! কাগজে-কলমে বিয়ে রইল সেই আগেরটাই। মধ্যখান দিয়ে কতকিছু! গত তিনটা মাস সালেহ বাড়িতে থাকলেও ঘরে রাত কাটায়নি। কিভাবে যে সবদিক রক্ষা করেছিল, আল্লাহ মালুম। নানা ছুতোয় বিবিকে শ্বশুরবাড়িতে রেখেছে। থাকা দরকারও ছিল। ভাবী সেদিনের পর এত বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, প্রায় মানসিকভাবে পাগল হয়ে যাওয়ার মত দশা! তিনদিন বেহুঁশের মত ছিলেন। বেশোধ ছিল কিছু অঙ্গ। পরে আস্তে আস্তে শোধ এসেছে। সালেহ তার সেই কষ্টের দিনগুলোর কথা কখনোই আমাদেরকে খুলে বলেনি। আমরাও পীড়াপীড়ি করিনি। শুধু একবার বলেছিল,

-আমার আশংকাটাই সত্যি হতে যাচ্ছিল।

-কোন আশংকা?

-ওকে চিরতরে হারানোর!

-কেন?

-সেদিন তাকে দেখার পর থেকেই সেই মানুষটা নাকি শুধু একটা কথাই বারবার বলে যাচ্ছিল: আমি তোমার মতো সুন্দর মানুষ আর দেখিনি। আমার আরেক বিবি আছে; কিন্তু চিন্তা নেই। তোমাকে আমি রানির মতো করে রাখব। আলাদা ঘর করে দেব! আমার অনেক জমিজমা আছে! তোমার নামে লিখে দেব।

-ভাবী কী বলেছিলেন?

-সে আগাগোড়া কেঁদে গেছে! টুঁশব্দটিও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেনি। উচ্চারণ করার সুযোগই পায়নি! শুধু রাতের বেলায়ই...! ভোর রাতের দিকে সে অচেতন হয়ে পড়েছিল! ফজরের পর থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত সময়ের কথা না বলাই ভালো। একে তো সে পাঁচদিনের অভুক্ত, তার উপর মানুষের শরীর তো! একদিনে কতটা ধকল সহ্য করতে পারে?

আমি বুঝতে পেরেছি, নবীজি কেন বিষয়টাকে এতটা ঘৃণার চোখে দেখে গেছেন! আল্লাহ তা'আলা কেন বিধানটা দিয়েছেন! তিনি বড়ই হাকীম! আমার মতো কিছু দুষ্ট পুরুষের রগ সোজা করতে এমন একটা দাওয়াই যে বড় বেশি দরকার ছিল! আমি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই ওর সেদিনের কষ্টকে অনুভব করার চেষ্টা করে যাচ্ছি! যতই ভাবি, তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা মাথাটা নুয়ে আসে! সে আমার জন্যে এতটা করল! এত বড় ত্যাগ স্বীকার করল! আমি কী করে এর প্রতিদান দিই! পারলে তার জন্য জীবনটা দিয়ে দিতে কসুর করব না।

ভালোবাসামাখা তরকারি

কত দিক থেকে ওয়াজের দাওয়াত আসে। সবার আবদার রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বয়েসও কম হয়নি। আবার ওয়াজের জন্যে মাদরাসার নিয়মিত ক্লাস বাদ দেয়াও শোভা পায় না! আজকের দাওয়াতটা ছিল গভীর এক গ্রামে। আগেই পৌঁছতে হবে। দুপুরের মধ্যে চলে গেলে ভালো। আসরের পর বয়ান করে ফিরে আসা যাবে; কিন্তু আসরের পর বয়ানে বসাতে আয়োজকরা রাজি হয় না। তারা চায় হুজুর শেষ পর্যন্ত থাকুক। শ্রোতারা হুজুরকে স্টেজে দেখলে বাড়তি আগ্রহ পায়। তারা অহেতুক

ওঠাউঠি করে না। হুজুরের বয়ান না শুনে বাড়ি যাবে না। অগত্যা হুজুরকে স্টেজের ওপর চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকতে হয়। তাসবীহের দানা ঘুরতে থাকে দু'আঙুলের ফাঁকে! ঠোঁট নড়তে থাকে! চোখ মুদে! স্মিত মিষ্টি হাসিতে! শাদাকালো আধপাকা দাড়ি বাতাসে নড়ে! ঝিরিঝিরি নারকেল পাতার মতো! ফাঁকে ফাঁকে বক্তার কথা শুনে শুভ্র দাঁতের ঝিলিক!

* * *

বৃহস্পতিবার যোহর পর্যন্ত দরস হয়, তারপর ছুটি। যোহরের পর মাদরাসার দফতরে হুজুরদের বিশেষ বৈঠক হয়। ছাত্রদের তালীম-তরবিয়ত নিয়ে আলোচনা হয়। প্রশাসন থেকে শুরু করে রান্নাবান্না সবকিছুই এজেন্ডায় থাকে। আগের সপ্তাহের ভুলগুলোর সংশোধন, সামনের সপ্তাহের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়! এত আগে গ্রামের একটা মাদরাসায় এমন পরিপাটি আয়োজন বিস্ময়কর!

সামনে ওয়াজের মওসুম! মাদরাসার হুজুরগণ কে কোথায় দাওয়াত পেয়েছেন, সেটারও খোঁজ-খবর করা হয় সাপ্তাহিক বৈঠকে। হুজুররা ওয়াজ করেন কোনো বিনিময় ছাড়া। আশপাশে দশ-বিশ গ্রামে যত ওয়াজ হয়, সবগুলোর তদারক এখান থেকে করা হয়। বক্তাও এখান থেকে দেয়া হয়। কিছু বক্তা বাইর থেকে আনা হয়। এতে করে গ্রামের মানুষের সঙ্গে মাদরাসার সম্পর্ক ভালো থাকে। লোকজনের মধ্যে বিশুদ্ধ দ্বীনি চেতনার প্রসার ঘটে। তারা বিপদে-আপদে মাদরাসার পাশে দাঁড়ায়। পুকুরের পানি সেঁচলে বড় মাছটা, ফসল হলে বড় লাউটা, বড় কুমড়াটা মাদরাসায় দিয়ে যায়। বিয়েশাদিতে বাড়িতে আয়োজন না করে মাদরাসাতেই আয়োজন করে।

* * *

হুজুর যোহরের পর বৈঠক শেষ করেই রওয়ানা দিলেন। বাজারের পূবমাথা থেকে নৌকায় চড়তে হবে। পালে বাতাস লাগলে আসরের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে রানিখালি বাজারে। সেখানে পালকি নিয়ে অপেক্ষা করবে কয়েকজন। হুজুর পালকিতে উঠতে চান না। কেমন যেন লাগে! চারজন মানুষ একজনকে কাঁধে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে! দেখতে কেমন অশোভন অশোভন মনে হয়। দাড়িতে সামান্য পাক ধরলেও শরীর এখনো তাগড়া। কিন্তু গাঁয়ের লোকজন নাছোড়বান্দা! জোর করে তুলে নেয়! তারপরও

হুজুর কিছুদূর পরপর নেমে কিছুক্ষণ হাঁটেন। বলেন, বসতে বসতে শরীরে আড় বেঁধে গেছে।

***

প্রতিবারই থাকার ব্যবস্থা হয় রশিদ জাহাজির বাড়িতে। আরও যারা ওয়াজ করতে আসেন, সবারই এখানে বন্দোবস্ত হয়। রশিদ জাহাজিরা এখানে কেউ থাকেন না। সবাই থাকেন বোম্বে। বছরে দু'বছরে এক-আধবার আসেন। কয়েকদিন থেকে আবার চলে যান। বিরাট বাড়ি, দিঘির মতো পুকুর, বিশাল বাগান এমনি এমনি শূন্য খাঁখাঁ পড়ে থাকে। একজন গরিব আত্মীয় দেখাশোনা করে। জমি-জিরেত দিনের পর দিন সব বর্গা দেয়া। ফসল বিক্রির টাকা সব গাঁয়ের মানুষের জন্যই ব্যয় করা হয়। ওয়াজের পুরো আয়োজনও রশিদ জাহাজির অর্থায়নে হয়। চিঠির মাধ্যমে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। রশিদ জাহাজি সবসময় বোম্বাই থাকেন না। জাহাজে করে আজ এ-দেশে, কাল ও-দেশে ঘুরে বেড়ান। বড় এক জাহাজের নাবিক তিনি! নিজের মালিকানায় কয়েকটা মালবাহী জাহাজ আছে। ছ'মাস অবশ্য বোম্বাই থেকে জিদ্দা রুটে হাজীদেরকে আনা নেয়াতেই কেটে যায়। বাকি সময় রেঙ্গুন-চাটগাঁও-সুমাত্রা-লংকা রুটে ব্যবসায়িক পণ্য আমদানি-রপ্তানি করে কাটে। এর মধ্যে ফাঁক করে একবার দেশ থেকে ঘুরে যান। চাটগাঁও এলে বাড়ি আসেন। আসতে না পারলে দেশের কিছু লোক চাটগাঁও থাকে, তাদের সঙ্গে দেখা করে দেশের খোঁজ-খবর নিয়ে যান। গ্রামের কারো সাহায্য-সহযোগিতা লাগলে টাকা-পয়সা রেখে যান। জাহাজির পরিবার থাকে বোম্বাইতে। সেখানেও আলিশান এক বাড়ি আছে।

***

হুজুর যতবারই এখানে ওয়াজ করতে এসেছেন, কোনোবারই জাহাজি বা তার পরিবারের কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। প্রতিবার মালিকশূন্য ঘরে থেকে গেছেন। অবশ্য মালিক না থাকলেও আদর-আপ্যায়নে কসুর হয়নি কখনো। খানাপিনার ঢালাও বন্দোবস্ত। ঘুম-বিশ্রামের আরামদায়ক ইন্তেজাম! দখিনা জানালা দিয়ে অহরহ নদীর শীতল জোলো বাতাসের আনাগোনা লেগেই আছে! যেদিকে চোখ যায়, শুধু সবুজ আর সবুজ! ফল-পাকুড়ের সমাহার! নারকেল, সুপুরি, কামরাঙা, জলপাই, বড়ই আরও অসংখ্য ফলগাছে বাড়িটা ম ম করছে।

***

মাদরাসার পক্ষ থেকে এক হুজুরকে একেক অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়। স্থায়ীভাবে। আগের যুগে যেমন শায়খ তার অনুগ্রহধন্য মুরীদকে খিলাফত দিয়ে দূরের কোনো ভাটি অঞ্চলে পাঠাতেন, অনেকটা সেরকম। হুজুরকে এতদাঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মাদরাসার পক্ষ থেকে। এখানকার ওয়াজ-নসীহত, শালিস-দরবার, বিয়েশাদি থেকে শুরু করে সবকিছুতে হুজুর থাকেন। মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম সাহেব অনেক দূরদর্শী মানুষ ছিলেন। বড় হুজুরকেও তার শায়খ মাদরাসার এলাকায় পাঠিয়েছিলেন। প্রত্যন্ত গ্রামের ধর্মশিক্ষাহীন মানুষকে দ্বীনের পথে ডাকতে! তাদের মধ্যে সঠিক দ্বীন প্রচার করতে! ইংরেজ শাসনের কারণে মোঘল আমলের ধর্মঘেঁষা শিক্ষাব্যবস্থার পুরোই খোল নলচে বদলে গিয়েছিল। এখন মানুষকে ধর্মের পথে রাখার জন্যে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে হচ্ছিল। তাই দূর-দূরান্তের গ্রামের দিকে, শায়খগণ তাদের একান্ত সোহবতপ্রাপ্ত খলীফাগণকে পাঠাচ্ছিলেন। বড় হুজুর এসে গ্রামের নামও রেখেছেন তার শায়খের নামে (নামটা বলা ঠিক হবে না)। প্রথম দিকে হুজুর বাড়ি বাড়ি গিয়ে দ্বীনের কথা শুনিয়েছেন। আধপেটে-খালিপেটে ঘুরে ঘুরে দাওয়াত দিয়েছেন। ধীরে ধীরে মানুষের মন তৈরি হয়েছে। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রশিদ জাহাজির সঙ্গে বড় হুজুরের পরিচয় হজের সফরে যাওয়ার সময় জাহাজে হয়েছিল। জাহাজি সাহেব হুজুরকে মাদরাসার খরচ-বিরচের ব্যাপারে আশ্বাস দিলেন। কোনো চিন্তা করতে নিষেধ করলেন। ভরসা পেয়ে হুজুর শুরু করে দিলেন। আস্তে আস্তে বড় হতে হতে আজ বিরাট এক মাদরাসা।

***

বড় হুজুর ইন্তেকাল করেছেন উনিশশ চল্লিশ সালে! মাদরাসা তার রেখে যাওয়া আদর্শেই চলছে। বড় হুজুর থাকতেই রশিদ জাহাজির বাড়িতে প্রতি বছর ওয়াজের আয়োজন হত। এছাড়াও মাঝেমধ্যে এক হুজুর এসে জুমা পড়িয়ে যেতেন। স্থায়ী ইমাম তো ছিলেনই। তারই পরিক্রমায় আজ আমাদের হুজুর এসেছেন। তিনি শুধু রশীদ জাহাজির নামই শুনেছেন। কখনো দেখেননি। হুজুরের বাড়ি মাদরাসার পাশে। বড় হুজুর সম্পর্কে তার আপন চাচা। মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হুজুর নিজের কাজের সুবিধার্থে ছোট ভাইকেও আনিয়ে নিয়েছিলেন। হুজুরের আব্বা এখানে

আসতে চাননি। নিজ এলাকায় তিনি খোনারি করে ভাল অবস্থাতেই ছিলেন। তাবিজ-তদবীর করতেন। জিন চালা দিতেন। লোকজন বিনিময়ে যা দিত, দিব্যি কেটে যেত দিন। বড় হুজুর ছোট ভাইকে বোঝালেন, ইলম শিখেছ, তাবিজ দিয়ে বেড়ালে ইলমের যথাযথ হক আদায় হবে না। জিন পুষলে ইলমের খেদমত হবে না।

-কিন্তু এতে তো অনেক মানুষের খেদমত হয়। উপকার হয়।

-তা তো হবেই, তুমি মাদরাসায় পড়ানোর পাশাপাশি খোনারগিরি করো। বিনামূল্যে?

-আচ্ছা ঠিক আছে! আপনি যা ভালো মনে করেন!

***

হুজুর জাহাজির ঘরের অতিথিশালায় বসে অতীতের কথা ভাবছিলেন। মৃদু পদশব্দে ঘোর কাটল। সামনে সদ্য কৈশোরে পা দেয়া সুন্দর একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক কৌতূহলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সালাম দিল। উত্তর দিলেন। মিষ্টি হাসিতে মুসাফাহা করলেন। কিশোর মেজবান তাজীমের সঙ্গে বসল হুজুরের সামনে।

-আমি হারুন।

-জাহাজি সাহেবের নাতি?

-জি।

-আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো! তুমি এসেছ নৌকা থেকে নেমেই শুনেছি। তোমার আব্বুর কথাও শুনেছি। আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেয়া ছাড়া আমরা আর কিইবা করতে পারি! আমরা দু'আ করবো ইনশাআল্লাহ! বোম্বাইয়ের এখন কী অবস্থা?

-খুবই খারাপ অবস্থা! হিন্দুরা যেখানেই মুসলমান পাচ্ছে, কচুকাটা করছে। ইংরেজ সৈন্যরা কিছুই করছে না।

-তোমার দাদু কোথায়?

-তিনি এখনো বোম্বাইতেই আছেন। সবকিছু গুছিয়ে একেবারে চলে আসবেন।

হুজুর, আপনি বিশ্রাম করুন। অনেক দূর থেকে এসেছেন।

-নাহ, এখন বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। ওয়াজের আয়োজন দেখতে যাব। সবার জন্য রাতের খাবারের কী ব্যবস্থা সেটা দেখতে হবে।

-কষ্ট করে একটু বসুন হুজুর, আম্মু সামান্য নাস্তা প্রস্তুত করেছেন।

-এখন কিছু খাবো না, দুপুরে খাবার খেয়েই বের হয়েছি। পারলে একটু পানি নিয়ে এসো।

-জি, ডাবের পানি রেখেছি! আম্মু কামরাঙার শরবতও বানিয়েছেন।

-কামরাঙার শরবত!

-জি!

-নিয়ে এসো!

নাস্তার প্লেটের পরিপাটি পরিবেশনা দেখে, কামরাঙার শরবত পান করে, হুজুর আনমনা হয়ে গেলেন। হারুনের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়ল।

-হুজুর, শরবতটা ভালো হয়নি?

-না না, কেন ভালো হবে না, খুব ভালো হয়েছে! অনেকদিন পর এমন শরবত খেলাম!

***

হুজুর কাজের তদারকি করতে ঈদগাহ মাঠে গেলেন। অন্যবার হুজুর কত হাসিখুশি থাকেন, এবার কী হলো! সবার মুখেই একই প্রশ্ন! নৌকা থেকে নেমেও হাসিমুখে সবার কুশল বিনিময় করলেন। জাহাজি সাহেবের বাসায় কি কিছু হয়েছে? সেখানে আবার কী হবে? কারো কাছে উত্তর নেই। ভালোয় ভালোয় ওয়াজ শেষ হলো। রাতের খাবার খেতে বসলেন সবাই। গ্রামের মানুষের জন্য ওয়াজের মাঠেই ঢালাও পাত পেতে দেয়া হয়েছে। হুজুর বিশেষ মেহমানদের সঙ্গে জাহাজি বাড়িতে বসেছেন। খেতে বসেও হুজুর খুব বেশি কথা বললেন না। পুঁই শাকের তরকারিটা মুখে দেয়ার পর থেকেই মনে ভীষণ উথালপাতাল শুরু হলো। কুঁচো চিংড়ি দিয়ে এভাবে পুঁইশাক একমাত্র আম্মুই রান্না করতে পারতেন। আর পারত আরেকজন মানুষ! হুবহু একই স্বাদের তরকারি এই দুজন ছাড়া অন্য কেউ কিভাবে রান্না করতে পারে? একটু না একটু তো ব্যতিক্রম হবেই তবে কি...!!!

***

রাতে হুজুরের ঠিকমতো ঘুম হলো না। এপাশ ওপাশ করে বিনিদ্র সময়গুলো কাটতে চাইছে না। মুখে যিকির করলেও মন ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য কোথাও! বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। পুকুরঘাটে গেলেন। ফকফকা চাঁদের আলো! জোছনায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক! গত বছরও এমন দিনে ঘাটলায় এসে বসেছেন। রাতে একাকী চাঁদের আলোতে বসে থাকতে

হুজুরের ভালো লাগে। বাড়িতেও পুকুরঘাটেই তাহাজ্জুদ পড়েন। খোলা আকাশের নিচে হালকা কুয়াশার শীত শীত গায়ে নামাজ পড়তে খুব ভালো লাগে। আজ চার রাকাতের বেশি পড়তে পারলেন না। মনটা বারবার আনমনা হয়ে যাচ্ছে! কোথাও একটা চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে! যে চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে সবসময় জানপ্রাণ চেষ্টা করেন, বারবার সেটাই জোর করে মাথায় ঘাই মারছে!

চুপচাপ বসে আছেন। গভীর রাত। ঝিঁঝি পোকারাও ঘুমিয়ে পড়েছে। থেকে থেকে একটা যমকুলি পাখি ডাকছে! হুজুর চমকে উঠে দেখলেন বাড়ির দিক থেকে কেউ একজন আসছে! হারুন?

-তুমি, এতরাতে?

-আম্মু পাঠিয়েছেন।

-তিনি ঘুমাননি?

-জি না! গতকাল থেকে তিনি কেমনযেন করছেন! অসুস্থ বোধ করছেন! এর আগে গ্রামে কখনো আসেননি, তাই হয়তো মানিয়ে নিতে সময় লাগছে! ঘুম আসছে না দেখে একটু আগে কলঘরে ওজু করতে গিয়ে দেখেন পানি নেই! কলের পানি নেমে গেছে! পুকুর থেকে পানি আনতে বের হয়ে আপনাকে ঘাটে বসা দেখলেন! আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন! কোনো সমস্যা হয়েছে কি-না, দেখে যেতে বললেন! আপনার সঙ্গে থাকতে বললেন।

-না না, কোনো সমস্যা নেই! তোমার থাকতে হবে না! তুমি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো! রাত এখনো অনেক বাকি!

-আম্মু বলেছেন থাকতে! চলে গেলে রাগ করবেন! আর আমার এখন ঘুম আসবে না। আম্মুও নামাযে দাঁড়াবেন! ঘরে গিয়ে একা একা বসে থাকার চেয়ে আপনার সাথেই থাকি।

-আচ্ছা ঠিক আছে বসো! তুমি এসেছ ভালো হয়েছে। কথা বলা যাবে! গভীর রাতে যদিও আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না! চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগে!

-আপনাকে আমি বিরক্ত করব না!

-না, তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগবে! তুমি আমার মেজবান! আমার কাছে তুমি সম্মানিত! শুধু আমার কাছে কেন, সবার

কাছেই তুমি আদরের। আমি গতকাল গ্রামের লোকদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি! সবাই তোমার আব্বুর জন্য অত্যন্ত ব্যথিত! ঘটনা যদিও অনেক আগের, তবুও তোমার আব্বুকে এষানকার কেউ ভুলতে পারেনি।

-আব্বুকে আমি বেশি কাছে পাইনি! খুবই ব্যস্ত থাকতেন সবসময়। তবুও তাকে আমার সবসময় মনে পড়ে! তার জন্য খুবই খারাপ লাগে! আরও খারাপ লাগে যখন ভাবি, সবারই একটা কবর থাকে! আত্মীয়-স্বজন কবর জিয়ারত করতে পারে! আব্বুর কোনো কবর নেই!

-হিন্দু দাঙ্গাবাজরা তোমার আব্বুকে কলেজেই আটক করেছিল?

-জি না, কলেজ থেকে বের হয়ে ট্রামে ওঠার পর! আব্বু মুসলিম লীগের হয়ে কাজ করতেন! কলেজে ক্লাস নেয়ার পর বাকি পুরো সময়ই দলের কাজে ব্যস্ত থাকতেন! এটা কলেজের কিছু হিংসুটে কংগ্রেস নেতার পছন্দ হয়নি। তারাই উস্কানি দিয়ে দাঙ্গাবাজদের লেলিয়ে দিয়েছিল। লাশটাও আমরা হাতে পাইনি। খবর পেয়েছি হিন্দুরা আরো লাশের সঙ্গে আব্বুর লাশও গুম করে ফেলেছে!

***

জোছনা ও কুয়াশার আলোছায়ায় দুজনে বসে আছেন। দুজনেই চুপচাপ। একটু পর হুজুর বললেন,

-হারুন, তোমাকে একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে! শুনবে তুমি?

-জি, হুজুর! অবশ্যই শুনব।

-তাহলে শোনো! তোমাকে কেন গল্পটা বলতে ইচ্ছে করছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না! আমি জীবনে কারো সাথেই গল্পটা করিনি। ইচ্ছা করেই গোপন রেখেছি। গল্পের মাঝে কোনো প্রশ্ন করবে না! গল্প শেষ হলে করতে পারবে।

-জি আচ্ছা।

-আমার আব্বু খোনারগিরি করতেন। খোনারগিরি মানে বোঝ? জিন-পরী আছর করলে চিকিৎসা করা। নানা রোগবালাই-অসুখবিসুখ নিয়ে লোকজন আব্বুর কাছে আসে। বেশির ভাগেরই জিনের সমস্যা। একজন লোক থাকতেন রেঙ্গুনে। আব্বুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার একটা মেয়ে ছিল। তার ওপর দুষ্ট জিনের আছর ছিল। জিন মেয়েটাকে খুবই কষ্ট দিত। ভাত খেতে দিত না। ঘুমুতে দিত না। দু'দণ্ড শান্তিতে থাকতে দিত না। কেমন এক অস্থির

ভঙ্গিতে মেয়েটা কাঁদত। অসহ্য ব্যথা করত পুরো শরীরে। মনে হত, অদৃশ্য কিছু একটা তাকে মুগুর দিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করছে। মেয়েটার ব্যথা উঠলে শরীরের এখানে ওখানে পড়ানো তেল মালিশ করে দিতে হয়। ব্যথারও কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না। একবার পিঠে তো আবার ডান পায়ে! একটু পরই পেটে! তেল মালিশকারীরা অস্থির হয়ে পড়ত। তাদের হাত মেয়েটার পুরো শরীরে ছোটাছুটি করত। দিনে দুই থেকে তিনবার ব্যথা উঠত। ব্যথা উঠলে মেয়েটা জবাই করা মুরগির মত আছাড়ি পিছাড়ি করত। তার কষ্ট দেখে অতি পাষাণ হৃদয়ের মানুষের চোখেও পানি এসে যেত। যতক্ষণ তেল মালিশ করা হত, ভাল থাকত। তাবিজ দিলে জিনেরা সেটা রাখতে দিত না। জোর করে ছিঁড়ে ফেলে দিত। তবে তাবিজ থাকাবস্থায় শরীরে ব্যথা দিতে পারত না। সারাক্ষণ পাহারায় পাহারায় রাখতে হত। তাবিজটা যাতে ফেলে দিতে না পারে!

***

রায়হানার আব্বু রেঙ্গুনে কাঠের ব্যবসা করতেন। তিনি ছিলেন আব্বুর বন্ধু।

-মেয়েটার নাম বুঝি রায়হানা!

-জি। তার আব্বুর বিশাল কারবার। জাহাজে করে এখানে সেখানে যেত। বউ-মেয়েও তার সঙ্গে রেঙ্গুনে থাকত। মেয়েটা অসুস্থ হওয়ার পর, চিকিৎসার সুবিধার্থে আব্বু তার বন্ধুকে পরামর্শ দিলেন, রায়হানার দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা দরকার! রেঙ্গুনে থাকলে চিকিৎসা সম্ভব নয়। তারচে ভাল হয়, রায়হানা মায়ের সঙ্গে কিছুদিন এখানে থাকুক। পরে সুস্থ হলে নিয়ে গেলেই হবে। আব্বু কুরআন হাদীসের রুকইয়া শরইয়্যা ব্যবহার করে চিকিৎসা করতেন। পরামর্শটা রায়হানার আব্বুর মনে ধরল। মা-মেয়েকে রেখে তিনি চোখের পানি মুছতে মুছতে রেঙ্গুন চলে গেলেন। শুরু হলো নতুন জীবন।

ঘরের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেল। কাজ বেড়ে গেল। রেঙ্গুন থেকে প্রতিমাসেই মোটা অংকের টাকা আসত। আব্বু টাকা পাঠানো নিয়ে বন্ধুর ওপর ভীষণ রাগ করতেন। কিন্তু বন্ধুর স্ত্রী বিনে পয়সায় থাকতে অস্বস্তি বোধ করবে ভেবে, টাকাটা নিতেন। পুরো টাকাই রায়হানার আম্মুর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। রায়হানার আম্মু নিজের কাছে কিছু রেখে বাকি সব টাকা তুলে দিতেন আমার আম্মুর হাতে। আম্মু নিতে না চাইলে তিনি বলতেন,

আপাতত জমা রাখুন! খরচ না হলে ফেরত নিয়ে নেব। সে টাকা জমে জমে একসময় অনেক হয়ে গেল। প্রতিমাসে রেঙ্গুন থেকে যে পরিমাণ টাকা পাঠানো হতো, তা দিয়ে আমাদের মতো দশটা পরিবার চলতে পারবে! আব্বু-আম্মু বিব্রত হলেও কিছু করার ছিল না। আমরা সবাই প্রাণপণে চেষ্টা করতাম রায়হানা যেন ভালো হয়ে যায়। আমি মাদরাসা থেকে ফিরেই তার সঙ্গে খেলতে বসে যেতাম। খেলার মাঝেই অনেক সময় তার ব্যথা উঠত! তাকেও আমার সঙ্গে মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো। প্রথম কয়েক জামাতে মেয়েরাও পড়তে যায় মাদরাসায়।

রেঙ্গুন থেকে চিঠি এল, হোটেলের খাবার খেয়ে রায়হানার আব্বু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি এসে কিছুদিনের জন্যে স্ত্রীকে নিয়ে যাবেন। সুস্থ হলে রেখে যাবেন। আব্বু চিঠির উত্তরে তাকে দ্রুত চলে আসতে বললেন।

***

সিদ্ধান্ত হলো, রায়হানা আমাদের কাছেই থেকে যাবে। এখানে থেকে পড়াশোনা করবে। পাশাপাশি চিকিৎসা চলতে থাকবে। সে রেঙ্গুন গিয়ে অসুস্থ হয়ে গেলে আবার এতদূর নিয়ে আসা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

মা চলে যাওয়ার পর রায়হানা সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ল। আমি ছাড়া তার কাছাকাছি বয়েসের কেউ ছিল না। মাঝেমধ্যে তার ব্যথা উঠত। আম্মু আর আমি মিলে তেল মালিশ করে দিতাম। আম্মু তাকে নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন। তাকে নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতেন। সবার কাছে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন। আমাদের সম্মিলিত চেষ্টার পরও রোগটা পুরোপুরি সেরে উঠছে না। আব্বুকে একদিন বলতে শুনেছি, বিয়ের আগে এ-রোগ পুরোপুরি সারবে না। তিনি চিঠিতে বন্ধুকে জানালেন, মেয়ে আপাতত সুস্থ। চাইলে নিয়ে যেতে পারেন। একমাস পর উত্তর এল, রায়হানার আম্মু কলেরায় মারা গেছেন। রেঙ্গুনে আরও অনেক মানুষ এ-রোগে মারা গেছেন। তিনিও রেঙ্গুন ছেড়ে কিছুদিনের জন্য বোম্বাইতে এক বন্ধুর ওখানে উঠেছেন। আপাতত মেয়েকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

***

রায়হানাকে তার মায়ের কথা শোনানো হলো না। তার আব্বু কখনো এলে, তিনিই নিজ মুখে মেয়েকে বলবেন। রায়হানা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। বড় হওয়ার পর জিনেরা আবার আছর করা শুরু করল। মধ্যখানে কিছুদিন

জিনদের উপদ্রব বন্ধ ছিল। আব্বু তার বন্ধুকে চিঠি লিখলেন, মেয়েকে আবার আগের অসুখে ধরেছে। বিয়ে দেয়া ছাড়া এটা পুরোপুরি কাটবে না। চিঠি পেয়ে রায়হানার আব্বু মেয়েকে দেখতে এলেন। আব্বুর কাছে মায়ের মৃত্যুর সংবাদ শুনে রায়হানা একেবারে ভেঙে পড়ল। তার কান্না, বাড়ির সবাইকে কাঁদালো। রায়হানা চুপচাপ হয়ে গেল। এমনিতে সে আগেও চুপচাপ শান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল। সারাক্ষণ আমার বা আম্মুর সঙ্গে লেপ্টে থাকত।

রায়হানার আব্বু আসার দুদিন আগে, চারদিক থেকে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা আসতে লাগল। প্রথমে বুঝতে না পারলেও, আকার-ইঙ্গিত থেকে বুঝতে পারলাম, রায়হানার বিয়ের আয়োজন চলছে। পাত্র আর কেউ নয়, স্বয়ং আমি। আব্বু আর রায়হানার আব্বু অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

***

বিয়ের পর অবস্থার খুব একটা হেরফের হলো না। সামান্য পরিবর্তন হলো, কিছুদিন থেকে রায়হানা আমার আর আব্বুর সঙ্গে দেখা দিত না, এখন দেখা দেয়। এছাড়া সে আগের মতোই আম্মুর সঙ্গে থাকে। তাকে রাতে একা থাকতে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমি থাকি আমার মতো করে। আমার খালাম্মা বলেছেন, আমাদের নাকি এখনো একসঙ্গে থাকার মতো বয়েস হয়নি। রায়হানা এখনো ছোট। রায়হানার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে আরও আগে। বাড়িতেই কিতাবপত্র পড়ে। বিয়ের আগে আব্বু তাকে পড়াতেন। আমিও পড়াতাম। মধ্যখানে কিছুদিনের জন্যে পড়ানো বন্ধ ছিল। আব্বু এখন আবার শুরু করতে বলেছেন। রায়হানা বেঁকে বসল। তার নাকি আমার কাছে পড়তে শরম লাগে। আম্মুর পীড়াপীড়িতে সে কিতাব নিয়ে বসে। বেহেশতী জেওর পড়াতে গিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়তে হল। কিছু মাসআলা আমাদের উভয়কেই বেশ লজ্জায় ফেলে দিল। সেও বুদ্ধিমতী, আগে থেকেই পড়ে আসত। যেসব মাসআলাকে সে বিব্রতকর মনে করত, সেগুলো পাশ কাটিয়ে সামনের পৃষ্ঠায় চলে যেত। আমিও না বোঝার ভান করে থাকতাম। কী দরকার তাকে লজ্জা দিয়ে! আমাদের সবার চেষ্টা ছিল, রায়হানা যেন একটুও কষ্ট না পায়! যেন মনে আনন্দ নিয়ে থাকতে পারে। রায়হানার আব্বু আমাদের বিয়ের একসপ্তাহ পরে রেঙ্গুন চলে গেলেন।

যাওয়ার আগে আম্মুর কাছে অনেক টাকা-পয়সা আর স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে গেলেন মেয়ের নাম করে। আম্মু সবকিছু একত্র করে ঘরের এক কোণে পুঁতে রাখলেন। জায়গাটা আমাকে আর রায়হানাকে চিনিয়ে দিলেন। বিয়ের পর রায়হানার আচরণ আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকল। আগে যেভাবে অসংকোচে মিশত, এখন কেমনযেন জড়তা এসে গেছে। সবার সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পায়। পাশাপাশি উল্টো আচরণও দেখা গেল। হঠাৎ করে ঘরে এসে দেখতে পেতাম, সে আমার রুমে চুপচাপ বসে আছে বা আমার বিছানায় শুয়ে আছে। আমি এলেই ধড়মড় করে পালাত। মুখ দিয়ে খুব একটা কথা বের হত না। অবশ্য আম্মুর সঙ্গে তার অনেক কথা হত। অনেক গল্প হত। একজন আরেকজনকে ছেড়ে যেন থাকতে পারত না। আমি বা আব্বু সামনে গেলে দুজনের মুখে কুলুপ এঁটে যেত। আব্বু গজগজ করতেন, আরে কী এমন গোপন কথা, আমাদের শোনা যাবে না?

***

রায়হানার সঙ্গে আমার দেখা হত পড়ার টেবিলে। বাড়তি কোনো কথা হত না। কিন্তু আমার প্রতিটি জিনিসে তার কোমল স্পর্শ অনুভব করতাম। আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে তার দীর্ঘ উপস্থিতি টের পেতাম! তার মেয়েলি সুবাস পুরো ঘর জুড়ে ছড়িয়ে থাকত। বিয়ের পর আস্তে আস্তে আমার মধ্যেও তার প্রতি কেমন ভালোলাগা তৈরি হতে লাগল। আগে আমরা ছিলাম খেলার সঙ্গী। পরে তার সেবাযত্ন করতে করতে তার প্রতি এক ধরনের দায়িত্ব বোধ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখনকার অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাশাপাশি এটাও জানা ছিল, আমরা দুজন একসঙ্গে ঘুমুলে ওর ক্ষতি হবে। ভীষণ ক্ষতি। জিনেরা ঈর্ষাবশত আবার আক্রমণ শুরু করবে। আরেকটু বড় হলে আশা করি সমস্যা কেটে যাবে। আব্বুর এমনটাই বিশ্বাস।

***

আম্মু আমাদের দুজনকে বেড়াতে পাঠাতেন। দিনে গিয়ে দিনে চলে আসা যায়, এমন আত্মীয়ের বাড়িতে। রিকশা চারপাশ থেকে ঢাকা থাকত কাপড় দিয়ে। রিকশায় বসেই সে ভীষণ আবেগে আমার হাত জড়িয়ে ধরত! মনে হত সে কিছু একটাকে ভয় পাচ্ছে। আমি যেন কোথাও হারিয়ে যাব। কিন্তু

প্রশ্ন করলে, কোনো উত্তর দিত না। পুরো পথে সে কথা বলত না বললেই চলে। আম্মু বোধহয় তাকে আগ থেকেই সতর্ক করে দিতেন। সেজন্য আমি উৎসাহী হলেও সে চরম নিরুৎসাহ দেখাত। কিন্তু পরম আদরে আমার হাতটা ধরে রাখত। কাঁধে মাথা রাখত। একটু পরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলত। বুঝতে পারতাম, কোথাও কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে বা হয়েছে। সে কাউকে বলতে পারছে না। যা হোক, আমি তার নীরব প্রেমে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। জীবনে তার সঙ্গে তো কম কথা হয়নি। আমরা দুজনে বেড়ে উঠেছি একই বাড়িতে। ছোটবেলায় ঘুমিয়েছি একই খাটে। একই প্লেট থেকে আম্মু দুজনকে লোকমা তুলে খাইয়ে দিয়েছেন। ভাইবোন একসঙ্গে বেড়ে উঠলে ঝগড়া হয়, আমাদের কখনো ঝগড়া হয়নি। সে আমাদের বাড়িতে আশ্রিত, এই চিন্তাটা কিছুতেই সে কাটিয়ে উঠতে পারত না। অথচ তার বাবা যে পরিমাণ টাকা পাঠায়, তা দিয়ে চেষ্টা করলে পুরো গ্রামের চাল কেনা যাবে। তার মা যখন থাকতেন, তখন সমস্যা হতো না। মা চলে যাওয়ার পর থেকেই তার মধ্যে রাজ্যের সংকোচ এসে বাসা বেঁধেছিল। আম্মু নানাভাবে তার এই সংকোচ কাটানোর চেষ্টা করেছেন। রাগ করেছেন। ধমক দিয়েছেন। আদর করে বুঝিয়েছেন। কিন্তু তার রোগাক্রান্ত শরীরে বাস করা মনটাও বোধহয় দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

***

একবার নানাবাড়িতে আমরা বেড়াতে গেলাম। রিকশা করেই রওয়ানা দিলাম। আগের মতো শাদা থানকাপড়ের শাড়িতে চারপাশ ঢাকা রিকশা। অর্ধেক পথ পেরোতেই রাত নেমে এল। রাতকে রায়হানার বেজায় ভয়। বাকি পথ সে আমাকে জড়িয়ে ধরেই থাকল। একটু পরপর থরথর করে কেঁপে উঠছে। নানা বাড়িতে পৌঁছেও তার ভয় কমল না। নানু তার অবস্থা দেখে আমাদেরকে একসঙ্গে থাকতে দিলেন। আম্মুর নিষেধের কথা আমাদের দুজনের কারো মনে থাকল না। এই প্রথম আমাদের একসঙ্গে রাত কাটানো। আমাকে পাশে পেয়েও তার ভয় কাটছিল না। তাকে নির্ভয় রাখতে রাখতেই রাত পোহাল।

পরদিন সকাল থেকেই রায়হানা আবার আগের মতো অসুস্থ হয়ে গেল। আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। তাকে ধরতে গেলে হিংস্র ভঙ্গি করে খামচে কামড়ে আমাকে রক্তাক্ত করে ফেলল। খবর পেয়ে আম্মু ছুটে

এলেন বাড়ি থেকে। এসেই নানুর সঙ্গে সেকি রাগ! আমাকে সামনে পেলে চিবিয়েই খেয়ে ফেলতেন। বারবার বুক চাপড়ে আফসোস করতে লাগলেন। কেন যে পাঠালাম এখানে! এখন কী হবে? ওর বাবাকে কী জবাব দেব? ছেলের বাবাকে কী উত্তর দেব!

* * *

রায়হানা দিনদিন আরও উন্মাতাল হয়ে উঠল। আব্বু একদিন সন্ধ্যায় জ্বিন হাজিরা মেলালেন। জ্বিনেরা বলল, এই বিয়ে ভেঙে না দিলে, দু'জনকেই মেরে ফেলবে। সন্তান হলে তাকেও মেরে ফেলা হবে। তাবিজ-কবযে কাজ হবে না। তাবিজ ফেলে দিতে কতক্ষণ? জ্বিনের কথা শুনে আব্বু-আম্মু ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জ্বিনেরা আরও হুমকি দিল, রায়হানাকে এ-বাড়ি থেকে না সরালে, ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। বাড়ির অন্যদেরকেও স্বস্তিতে থাকতে দেবে না।

আব্বু চিঠি লিখলেন বন্ধুর কাছে। সমস্যার কথা বিস্তারিত লিখলেন। আমার শ্বশুর চিঠি পেয়েই ছুটে এলেন। রায়হানা এমনিতে ভালোই থাকে। কিন্তু কোনওভাবে যদি আমার সঙ্গে কথা বলে বা আমার দিকে ফিরে তাকায়, সাথে সাথে জ্বিনেরা ব্যথা দিতে শুরু করে। ব্যথা সইতে না পেরে রায়হানা পশুর মতো গোঙাতে থাকে। আগে আমি সাহায্য করতে পারতাম। এখন আমি কাছে গেলে তার কষ্ট আরও বেড়ে যায়। তাবিজটা বাহুতে বেঁধে দিলে ব্যথা চলে যায়। কিন্তু তাবিজ বাঁধাটাই হয়ে দাঁড়ায় এক অসম্ভব কাজ! সে সময় রায়হানার চিকনা শরীরে এত অতিমানবিক শক্তি কোত্থেকে যে আসে! আম্মু একা তাকে কিছুতেই তাবিজটা পরাতে পারেন না। বাধ্য হয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হয়। তাবিজ লাগানোর পর তেল মালিশ করার সাথে সাথেই রায়হানা নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়ে একদিন আমার চোখে পানি দেখে আম্মু বকা দিয়ে বললেন. তখন মনে ছিল না।

* * *

জ্বিনেরা বারবার হুমকি দিতে থাকল! বিয়েটা না ভাঙলে রায়হানাকে বাঁচতে দেয়া হবে না। আমাদের দু'জনের নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল দুশ্চিন্তায় কী হবে আমাদের? দু'জনে একে অপরকে ছেড়ে কিভাবে থাকব? কিন্তু জীবন থেমে থাকে না। আব্বু আর শ্বশুর বসে তিক্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। বিয়েটা ভেঙে ফেলা হবে। মেয়েকে নিয়ে তিনি আপাতত রেঙ্গুন চলে

যাবেন। আব্বু অবশ্য বলেছিলেন, একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখা যেতে পারে। বিয়েটা থাকুক। দেখি কী হয়? রায়হানার আব্বু রাজী হলেন না। এরমধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটল। পুকুরঘাটে আছড়ে পড়ে রায়হানার হাত ভেঙে গেল। হাত ভাঙার পর রায়হানা পানিতে পড়ে গেল। আম্মু রায়হানার চিৎকার শুনে ছুটে গেলেন পুকুরের দিকে। সেখানে কাউকে পেলেন না। আম্মুর হাউমাউ কান্না শুনে আমরা ছুটে গেলাম। পুকুরের দিকে তাকিয়ে দেখি, রায়হানার ওড়না ভাসছে। কোনও কিছু চিন্তা করা ছাড়াই ঝাঁপ দিলাম। পানিতে ডুব দিয়ে দেখি রায়হানা কেমন একটা ভঙ্গিতে দুমড়ে মুচড়ে পানির তলার দিকে চলে যাচ্ছে। তার হাত ধরে প্রাণপণে হ্যাঁচকা টান দিলাম। ততক্ষণে আব্বুও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমার শ্বশুরও।

***

জ্বিনেরা যেন একটা সতর্ক সংকেত দিল। এ-ঘটনার পর আব্বুর মনে আর কোনও দ্বিধা রইল না। রায়হানার খাওয়া-ঘুম সব বন্ধ হয়ে গেল। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা এখন থেকেই অনুভব করতে শুরু করেছে। এ-এক অদ্ভুত বিবাহবিচ্ছেদ। কাঁদতে কাঁদতে তার চোখের নিচে কালি জমে গেছে। আমার কথা বলাই বাহুল্য। আম্মুর অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। কত দিনের সম্পর্ক! কত স্মৃতি! কত হাসি! সব ফিকে হয়ে যাবে জালেম জ্বিনের দুরাচারে? আমরা দু'জনে মিলে ঠিক করেছিলাম, যাই হোক, কিছুতেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাব না। মরে গেলেও না।

***

আব্বু আমার কথা জানতে পেরে, ডেকে পাঠালেন। অনেকক্ষণ ধরে বোঝালেন। শেষে সিদ্ধান্তের ভার আমার উপর ছেড়ে দিলেন। আমি মাদরাসায় গিয়ে হুজুরদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। কেউ সিদ্ধান্তসূচক কিছু বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, জীবননাশের আশংকা থাকলে, বিয়ে ভেঙে দেয়াই ভাল। এতে দু'জনেরই লাভ। আমাদের দেরি দেখে, জ্বিনেরা আবার উৎপাত শুরু করল। তাকে কষ্ট দিচ্ছে। এত অসহ্য কষ্টের পরও রায়হানা বিয়ে ভাঙার পক্ষে মত দিল না। সে মরে যেতে রাজি! তাকে অনেক করে বোঝালাম! তার এক কথা!

–[illegible] ছেড়ে আমার বেঁচে থেকেই বা কী লাভ?

***

আমি বড় দোটানায় পড়ে গেলাম। রায়হানাকে বোঝানোর দায়িত্ব নিলেন আমার শ্বশুর। আম্মুও মনকে শক্ত করে ক্রমাগত তাকে বুঝিয়ে চললেন। উঁহু, কিছুতেই কিছু হল না। তার এক কথা, সে মরে গেলেও বিয়ে ভাঙতে রাজি নয়। অগত্যা সবাই আমার হাতে ছেড়ে দিলেন বিষয়টা। জ্বিনের উৎপাত বেড়েই চলছিল। জ্বিন কথা দিয়েছে, বিয়ে ভাঙলে সে আর কখনো রায়হানাকে উত্যক্ত করবে না। তাকে চিরতরে ছেড়ে চলে যাবে। এরপর আমার আর করার কিছু ছিল না। মনকে পাথর করে, নয়নজলে ভাসতে ভাসতে ঘোরের মধ্যে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যেই দুনিয়ার রঙ বদলে গেল। রায়হানা আঘাত সইতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। অচেতন অবস্থাতেই গরুর গাড়িতে করে তাকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন তার আব্বু। আমার আব্বুও সঙ্গে গেলেন। আম্মুও গেলেন রেল স্টেশন পর্যন্ত। আমি তখন জীবন্মৃত। রায়হানা আমার জীবনের সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চলে গেল। রেখে গেল একরাশ বেদনামাখা স্মৃতি। এই শোক কাটিয়ে উঠতে বছরখানেক সময় লাগল। বড় চাচা আমাকে জোর করে শিক্ষকতায় লাগিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে তালিবে ইলম পড়ানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আব্বু-আম্মু অনেক চেষ্টা করেছেন আবার বিয়ের ব্যবস্থা করতে। বড় চাচা লাঠি হাতে তেড়ে এসেছেন; কিন্তু কিছুতেই বিয়ের কথা মনের কোণেও ঠাঁই দিতে পারিনি। শেষে বড় চাচাই বলেছেন, থাক, তাকে জোর করার দরকার নেই। জোর করে বিয়ে করালাম আমরা, এর পরিণতি ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে। মন্দ হলে আরেকটা মেয়ের জীবন নষ্ট করার দায় কে নেবে?

***

-হারুন, আমার জীবনের গল্প আপাতত এখানেই শেষ। গল্পটা শুনে তোমার কি কোনও প্রশ্ন জেগেছে?

-জ্বি না।

-ও, আমি ভেবেছিলাম আমার গল্প শুনে তোমার মনে অনেক প্রশ্ন দেখা দেবে! তাই একদিনের পরিচয় সত্ত্বেও গল্পটা যেচে তোমাকে শুনিয়েছি। এখন দেখছি আমার অনুমানে মনে হয় ভুল ছিল। যাক, পৃথিবীতে কত বিচিত্র ঘটনাই তো ঘটে।

-গল্পটা শুনে আমার খুবই খারাপ লাগছে। সেই মানুষটার কষ্টের কথা ভেবে চোখে পানি এসেছে। একটা প্রশ্ন অবশ্য জেগেছে!

-কী প্রশ্ন?

-আপনি তাহলে আর বিয়ে করেন নি?

-তোমার কী মনে হয়, যার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে শুরু করে দীর্ঘ একটা সময় পরম আপনের মতো সময় কাটিয়েছি, যাকে নিজে পাষাণ হয়ে তালাক দিয়েছি, তাকে ছেড়ে অন্য কাউকে বিয়ে করা সম্ভব? আমি শিক্ষকতাকেই ব্রত হিশেবে নিয়েছি। বিয়ের শখ মিটে গেছে। যাকে ছোটবেলা থেকেই বউ হিশেবে কল্পনা করে বড় হয়েছি, যাকে বউ হিশেবে পেয়েও নিজের ইচ্ছায় হারিয়েছি, তার শূন্যস্থান অন্য কেউ পূরণ করতে পারবে?

-পরে আর কখনো যোগাযোগ হয়নি তার সাথে?

-নাহ, কিভাবে হবে? কেন হবে? তালাকের সাথে সাথেই সে আমার বেগানা হয়ে গেছে না! তবে আব্বুর সঙ্গে তার বন্ধুর নিয়মিত যোগাযোগ হত! আব্বু আমাকে সেসব জানতে দিতেন না।

-আপনার কখনো তার সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছে হয়নি?

-হয়নি আবার! প্রতিমুহূর্তে হয়েছে! এখনো হয় প্রতিটি মুহূর্তে! কিন্তু মনের হারাম ইচ্ছা প্রশ্রয় দেব কেন? আর ইচ্ছা হলেও তাকে পাবো কোথায়? তবে তাকে হারানোর স্থায়ী বেদনার পাশাপাশি, তাকে একটা আনন্দ সংবাদ দিতে পারার আক্ষেপও সারাক্ষণ কুরে কুরে খায়!

-কী সংবাদ?

-তাকে যে দু'টি জ্বিন উত্যক্ত করত, আব্বু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

-কিভাবে?

-আব্বু বড় এক বুযুর্গের মাধ্যমে, জ্বিনসমাজের নেতাদের কাছে নালিশ দিয়েছিলেন। তারা ওই দুষ্ট জ্বিনদ্বয়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

-কী ব্যবস্থা?

-সেটা আমি জানি না। তাদের পক্ষ থেকে শুধু এটুকু আশ্বাস দেয়া হয়েছে, আর কখনো ওই জ্বিনগুলো আমাদের উত্যক্ত করবে না! কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এটা আর কখনো পুষিয়ে ওঠা যাবে না। সুন্দর একটা জীবন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল! সব ছারখার হয়ে গেল! তারপরও আমি মনে করি, আমার জীবনটা অপূর্ণ নয়। কতজন বিয়ে করার পর বছর না ঘুরতেই স্ত্রী মারা যায়! তাদের তুলনায় আমি মহাভাগ্যবান। ছেলেবেলা থেকেই জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বেড়ে উঠেছি। বিয়ের

পর আমরা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মতো জীবন যাপন করতে না পারলেও, দীর্ঘ সময় একসঙ্গে ছিলাম! আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিয়ের আগে (জানামতে) গুনাহ হয় এমন কোনও আচরণ করিনি। দু'জনেরই কেউই সামান্য পর্দাও লঙ্ঘন করিনি। অবশ্য রায়হানার পর্দার বয়েস হওয়ার পর খুব অল্প সময়ই আমরা আলাদা ছিলাম। চটজলদি আমাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

-সত্যি করে বলুন তো, তার সঙ্গে আপনার এখন দেখা করতে ইচ্ছা হয় না!

-হলেও সেটা কী করে সম্ভব? তবে তার একটা আমানত আমার কাছে রয়ে গেছে!

-কী আমানত?

-তার আব্বু প্রতিমাসে অনেক টাকা পাঠাতেন। সেগুলো আমার আম্মু জমিয়ে রাখতেন। তার আব্বু বিয়ের সময় অনেক অলংকার দিয়েছিলেন। সেগুলোও আমাদের বাড়িতে রয়ে গেছে!

-মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে নেননি?

-আব্বু-আম্মু সেগুলো দিয়ে দেওয়ার জন্যে অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন। রায়হানার আব্বুর এককথা, এগুলো আমি কিছুতেই নিতে পারব না। আপনারা 'ওকে' আবার বিয়ে করানোর সময় নতুন বৌকে দিয়ে দেবেন। আমার পক্ষ থেকে এটা উপহার হিশেবে থাকবে! ও আমার মেয়ের জন্যে অনেক অনেক কষ্ট করেছে! এর বিনিময়ে আমি তার জন্যে কিছুই করতে পারিনি। অলংকারগুলো নেয়ার জন্যে আমার উপর জোর খাটালে মনে কঠিন চোট পাবো! দয়া করে এ-প্রসঙ্গ আর তুলবেন না।

-অলংকারগুলো এখন কোথায়?

-বাড়িতে আছে। শুধু অলংকার নয়, অনেক টাকাও রাখা আছে। যার টাকা সে নেই, আমি কিভাবে তার টাকা খরচ করি।

-আচ্ছা, এমনো কি হতে পারে না, আপনার মতো তিনিও আর বিয়ে করেন নি?

-মনে তো কত কিছুই কল্পনায় আসে! মাঝেমধ্যে মনে হয়েছে, একবার রেঙ্গুন গিয়ে খোঁজ নিলেই হয়। যার আমানত তার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। রেঙ্গুন যাওয়ার চিন্তা এখনো আছে। দেখি কী করা যায়!

-বড় অদ্ভুত আপনাদের জীবনকথা! আপনার আব্বু-আম্মু কোথায়?

-তারা জান্নাতবাসী হয়েছেন অনেক আগে!

* * *

ভোররাতেই ফিরতি নৌকায় চড়তে হবে। মাদরাসার সবক বাদ দেয়া যাবে না। যে করেই হোক নয়টার মধ্যে মাদরাসার ঘাটে নৌকা ভেড়াতে হবে। মাঝিকে বলা আছে।

-হারুন, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। তুমি এখন কী করবে ভেবেছ?

-দাদু বোম্বাই থেকে এলে সিদ্ধান্ত নেবেন।

-ওখানে তুমি কী পড়তে?

-একটা মিশনারি স্কুলে।

-আমার খুব ইচ্ছা, তুমি মাদরাসায় পড়ো।

-আমি তো বড় হয়ে গেছি! এখন মাদরাসায় ভর্তি নেবে?

-কেন নেবে না? অবশ্যই নেবে। ভর্তি না করালে আমি নিজে তোমাকে পড়াব।

-শুরু থেকেই আম্মুর ইচ্ছা ছিল, আমি মাদরাসায় পড়ি; কিন্তু আব্বুর ইচ্ছার সামনে তিনি জোর খাটাননি। এখন আমি নিজ থেকে মাদরাসায় পড়ার আগ্রহ দেখলে খুবই খুশি হবেন।

-ঠিক আছে! দাদু এলে তাকে নিয়ে মাদরাসায় চলে এসো।

ওয়াজ থেকে ফেরার পর ঠিক দু'মাসের মাথায় এক বিকেলে রশীদ জাহাজি মাদরাসায় এলেন। সঙ্গে হারুন। এমনিতেই বাড়িতে এলে মাদরাসা থেকে একপাক ঘুরে যান। মাদরাসায় এসে প্রথমে বড় হুজুরের কবর জিয়ারত করেন। তারপর বর্তমান মুহতামিম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যান। আজ সামান্য ব্যতিক্রম ঘটল। অন্যবার সঙ্গে কেউ থাকে না। এবার নাতিকে নিয়ে এসেছেন। কবর যেয়ারত করে, আজ প্রথমে গেলেন হুজুরের কামরায়। হুজুরের সঙ্গে দেখা করে, নাতিকে হুজুরের কাছে সোপর্দ করলেন। মুচকি হেসে বললেন—

-আপনারা কথা বলুন, আমি মুহতামিম সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসছি! আপনার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরি কথা আছে!

হারুনকে পেয়ে হুজুর যারপরনাই খুশি হলেন। পরম সমাদরে নিজের খাটিয়ার উপর নিয়ে বসালেন। একজন ছাত্রকে পাঠালেন ডাব পেড়ে আনতে। হারুন মিটিমিটি হেসে বলল—

-আপনার রেঙ্গুন যাওয়ার কষ্ট বোধ হয় আর করতে হবে না!

-একথা কেন বলছ?

-আপনি সেদিন চলে আসার পর, আম্মুর কাছে আপনার ঘটনা বলেছি! একটু শুনেই আম্মু ভীষণ অস্থির হয়ে পড়লেন। ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমাকে পাঠালেন, তুই এখুনি গিয়ে নৌকাটা ঠেকা! তখন বাজে সাতটা! নৌকা পাব কোথায়? আম্মু পারলে তখুনি আমাকে নিয়ে আপনার কাছে চলে আসেন! পরে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এসেছেন!

হুজুর ফুঁপিয়ে উঠে শুধু বললেন:

-সুবহানাল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহু আকবার!

তারপর সিজদায় পড়ে দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। হারুন ব্যাপারটা দেখে বিচলিত বোধ করল। একবার মায়ের অবস্থা আবার হুজুরের এই অবস্থা তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলল। মাদরাসায় এসে বুঝতে পেরেছিল, হুজুর এখানে অনেক বেশি সম্মানিত। সবার অনেক মাননীয়! এতবড় একজন (রাশভারী) মানুষের মনে এত কষ্ট আর এত আবেগ লুকিয়ে ছিল? দীর্ঘক্ষণ পর হুজুর লালভেজা চোখে সিজদা থেকে মাথা তুললেন। হারুনকে অকস্মাৎ জড়িয়ে ধরে বললেন— 'রাব্বুল আলামীন সত্যিই মহান! তিনি সত্যিই মহান! আমার মতো নগণ্য বান্দার প্রতি তার নেয়ামতের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। তারপর কী হলো সব খুলে বলো আমাকে!'

-আম্মু যখন শুনলেন, আপনি আর বিয়ে করেন নি। এখনো তার স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে আছেন। তার আমানত এত বছর ধরে বুকে আগলে রেখেছেন, আর্তনাদ করে উঠেছেন। আপনার আব্বু-আম্মুর ইন্তেকালের কথা শুনে হাউমাউ করে কেঁদেছেন। আমার নানাজানের মৃত্যুর সময়ও তাকে এমন করে কাঁদতে দেখিনি!

-তোমার নানাজানের কথা বলো! আমাদের বাড়ি থেকে যাওয়ার পর কী হল?

-তিনি মেয়েকে নিয়ে রেঙ্গুনেই ফিরে গিয়েছিলেন। আমার দাদুর সঙ্গে তার অনেক আগ থেকেই পরিচয়। দাদুর জাহাজে করে তিনি এখানে ওখানে কাঠ সরবরাহ করতেন। সে সুবাদে দাদু রেঙ্গুন এলে নানাজানের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করতেন। দাদু সেবার গিয়ে দেখলেন আম্মুর শোচনীয় অবস্থা। বন্ধুকে পরামর্শ দিলেন, মেয়েকে দ্রুত কোনও উন্নতমানের হাসপাতালে ভর্তি করাতে! রেঙ্গুনে ভাল ক্লিনিক কোথায়!

দাদু বললেন, তাহলে বোম্বাই নিয়ে চলো। নানা একটু চিন্তা করে রাজি হয়ে গেলেন। বোম্বেতে আম্মুকে সবচেয়ে দামী ক্লিনিকে ভর্তি করানো হল।

ওখানে শুধু ইংরেজরাই ভর্তি হতে পারতো। নেটিভ কোনও সিভিলিয়ান সেখানে ভর্তি হওয়া তো দূরের কথা, গেট দিয়েও প্রবেশ করতে পারত না। আমার আব্বুর এক ইংরেজ ক্লাসমেট ছিল। তার বাবা ছিলেন বড় সামরিক অফিসার। তাকে দিয়ে সুপারিশ করিয়ে আম্মুকে ভর্তি করানো হল। শুরু হল দীর্ঘ চিকিৎসাপর্ব। পাক্কা একটা বছর আম্মু কারো সঙ্গে কোনও কথা বলেননি। সারাক্ষণ হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতেন আর কাঁদতেন। তার জন্যে সার্বক্ষণিক নার্স রাখা হয়েছিল। টাকা-পয়সার কোনও সমস্যা ছিল না। নানার আর কোনও সন্তান নেই। আর বন্ধুর মেয়ের জন্যে দাদাজিও জান কুরবান করতে একপায়ে খাড়া ছিলেন। আম্মুর অবস্থা ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এল। তিনি নানাভাইয়ের কাছে রেঙ্গুনে ফেরার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দাদাভাইয়ের টেলিগ্রাম পেয়ে নানাভাই বোম্বে হাজির হলেন। এবার দেখা দিল নতুন সমস্যা!

-কেমন?

-আব্বু বেঁকে বসলেন! তিনি কিছুতেই আম্মুকে হাতছাড়া করতে চান না। তিনি অতীতের পুরো ঘটনার জানার পর আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। আম্মু তো কথাই বলেন না। তিনিও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, তিনি জীবনে আর বিয়ে করবেন না। ইবাদত-বন্দেগি করে জীবন কাটাবেন। এটা শুনে আব্বুও পাল্টা হুমকি দিলেন, তিনিও দরবেশ হয়ে বিবাগী হয়ে যাবেন। অচলাবস্থার সৃষ্টি হল।

***

দাদু আর নানা রুদ্ধদ্বার পরামর্শে বসলেন। দু'জনের মধ্যে কী কথা হল জানতে পারিনি। সকালে উঠে নানাভাই তার মেয়েকে নিয়ে আরেকবার রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসলেন। বাপ-বেটিতে কী কথা হল, তারাই জানেন। সকালে কাঁদতে কাঁদতে আপনার মতোই চোখ লাল করে ফেলা আম্মুর, হাসতে হাসতে চোখ ফুলে ওঠা আব্বুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। তারপর আর কি। নানাজান মেয়েকে রেখে ফিরে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে।

-তোমার দাদাজান কি আমার বিষয়টা জানেন?

-তার জানতে আর কিছু বাকি নেই। আমার কাছে সব শোনার পর, আম্মু সবকিছু বিস্তারিত জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন দাদুর কাছে। দাদু পত্রপাঠ সাথে সাথে চলে এসেছেন। নিজ কানে সব শুনে, সবদিক গুছিয়ে এখানে এসেছেন। একটু পরে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

-আমি রায়হানা বলার পরও তুমি তোমার আম্মুকে চিনতে পারোনি কেন?

-আমি তো জানতাম আম্মুর নাম 'রাওহা'। তাই ধরতে পারিনি। আর সে মহিলা আম্মু হতে পারেন, এমনটা ঘুণাক্ষরেও আমার কল্পনাতে আসেনি।

-কেন, আজ এখন আমাকে যা বললে, সেগুলো আগে জানতে না?

-জ্বি না। আম্মু-আব্বু-দাদু কেউই এসব আমাকে বলেননি। জানতে পারলে কি দুমাস পর আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে হত! সেদিনই আমি আপনাকে চিনে যেতে পারতাম!

-তুমি না আজ না এলেও তোমার সঙ্গে আমার শিঘ্রি দেখা হত।

-কিভাবে?

-তুমি পড়তে আসবে বলেছিলে! তার কোনও খোঁজ-খবর পাচ্ছিলাম না। আর...!

-আর কি?

-তোমার কি মনে পড়ে, সেদিন আমাকে বিকেলে কামরাঙার শরবত পান করিয়েছিলে! রাতে কুঁচো চিংড়ি দিয়ে পুঁইশাক পরিবেশন করেছিলে!

-জ্বি!

-সে দুটো পদ খেয়েই আমি প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম, এটা রায়হানার হাতের তৈরি না হয়ে যায় না। কতকাল কেটে গেছে! তবুও তার রান্নার হাত আমি নিপুণভাবে চিনতে পারবো! শত বছর পরে শত তরকারির মধ্যেও তার হাতের রান্না করা তরকারি আর শরবত আমি মুখে দিয়েই চিনতে পারব। আর তুমি সেদিন বিকেলে শরবত আর ডাবের পানি যেভাবে পরিবেশন করেছ, সেটাই আমার প্রথম চোখে পড়ে। কারণ এভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবেশন করতে দেখেছি শুধু আমার আম্মাকে। তার থেকে শিখেছে তোমার আম্মু।

এত নিশ্চিত হওয়ার পরও তুমি যখন 'রায়হানা' নাম শুনে চিনতে পারলে না, তখন কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যেই মূলত প্রথম পরিচয় হওয়ার সত্ত্বেও তোমাকে আমার জীবনকাহিনী শোনাতে বসেছিলাম। কিছুটা দ্বিধা নিয়ে মাদরাসায় ফিরলাম। যতই দিন গড়াল, ততই মনের অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মনের দৃঢ় বিশ্বাস আবার পোক্ত হচ্ছিল। এ রায়হানা না হয়েই যায় না।

মাগরিবের আযান হয়ে গেল। নামাজের পর হুজুর হারুনকে নিয়ে কামরায় এসে বসলেন। একটু পর জাহাজি সাহেবও এলেন। কোনও ভূমিকা ছাড়াই বললেন—

-আমি আপনার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমার একটা মেয়ে আছে! আপনি আমার মেয়েকে জীবনসঙ্গী হিশেবে গ্রহণ করলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব! যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ না করেন তাহলে বাইরে আপনার ওস্তাদ মুহতামিম সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন, তাকে দিয়ে হুকুম জারি করাতে হবে!

-ইন্নালিল্লাহ! হুজুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন? হুজুরের ইশারাই আমার জন্যে আদেশ!

-তাহলে চলুন রওয়ানা দিই!

-এখনই?

-জ্বি। এখনই। মুহতামিম সাহেবও যাবেন!

-সত্যিই?

-জ্বি তিনিই বিয়েটা পড়াবেন। রাতে থাকবেন। ওদিকের সব আয়োজনও ইতোমধ্যে প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার কথা।

-আমাকে একটু সময় দিতে হবে। বাড়িতে গিয়ে আমি একটা ব্যাগ নিয়ে আসব। আর ঈশা পড়ে নৌকায় উঠলে ভাল হয়। তাহলে জামাতটা ফওত (মিস) হবে না।

-ঠিক আছে! জামাইয়ের আবদার শিরোধার্য।

***

ঈশার পর ভাত চারটা নাকেমুখে গুঁজেই বরযাত্রীর ছোট্ট কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। হুজুর লাজুক মুখে জুব্বা-পাগড়ি পরে ব্যাগ হাতে বের হলেন। নৌকায় চারজন মাঝি আনা হয়েছে! পালাক্রমে দাড় টানার জন্যে। আকাশ জুড়ে থালার মতো চাঁদ! হুজুর সেদিকে তাকিয়ে আছেন! চাঁদের আলোয় চারদিকে ভেসে যাচ্ছে! পানির ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ! দাড় টানার ছন্দময় শব্দ রাতের অটুট নিরবতা ভেঙে দিচ্ছিল! হালকা শীতছোঁয়া বাতাস বয়ে যাচ্ছে! নৌকার আরোহীরা চুপচাপ বসে যে যার ভাবনায় মশগুল! অনেক দূরে আরেকটা নৌকায় মিটিমিটি বাতি জ্বলছে! হুজুর সবার সঙ্গে থেকেও ভাবনার অতলে ডুবে গেলেন! কত কথা! কত স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে! জীবনে যা কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি, তাই ঘটতে চলেছে! যেদিকেও চোখ যাচ্ছে, শুধু একটি মায়াবী মুখই ফুটে উঠছে! তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন! যেন কাছে গেলেই পরম যতনে জড়িয়ে ধরবেন!

তামীমা

ইমাম সাহেব বিয়ে করলেন এক তামীমি কন্যাকে। বিয়ের কয়েকদিন পর দেখা করতে এলেন কাজি সাহেবের সঙ্গে। কাজি সাহেব সহাস্যে বললেন,

-বিয়ে করেছ শুনলাম!

-জ্বি!

-পাত্রী কোন গোত্রের?

-বনু তামীম!

-হুম, দারুন কাজ করেছ! বিয়ে করলে একজন তামীমাকেই বিয়ে করা চাই! তাদের মতো নারী হয় না। বিবি হিশেবে তারা অসাধারণ!

-বাহ, তামীমি কন্যাদের সম্পর্কে আপনার বেশ অভিজ্ঞতা দেখছি!

-তো আর বলছি কি! আমার জীবন থেকেই বলছি, শোনো! কী এক কাজে বনু তামীমে গিয়েছি। তীব্র রোদে গলা শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেছে। একচুমুক পানি না পেলেই নয়। পানির সন্ধানে একটা ঘরে ঢুঁ মারলাম। ভেতরে এক মহিলা বসা। পাশেই অনিন্দ্য সুন্দর এক যুবতী। আমাকে দেখে সে প্রজাপতির মতো উড়ে অন্দরে চলে গেল।

-একঢোক পানি হবে?

-কেন হবে না বাছা, ওখানে বসো। এই যয়নব, পানি এনে দে! তুমি কোন ধরনের পানীয় পছন্দ করো?

-যা হোক একটা কিছু পান করতে দিলেই হবে!

-খুকি, মেহমানকে দুধ এনে দে! মনে হচ্ছে মানুষটা অনেক দূর থেকে এসেছে!

মেয়েটা আমাকে দুধ এনে দিল। আড়াল থেকেই দুধটুকু ঠেলে দিল। তৃপ্তিভরে পান করলাম। মহিলার কাছে জানতে চাইলাম,

-মেয়েটা আপনার কী হয়?

-যয়নবের কথা বলছো? সে আমার মেয়ে!

-তার বিয়ে হয়ে গেছে?

-না, খোঁজ-খবর চলছে!

-আমার কাছে তাকে বিয়ে দেবেন?

-তুমি যোগ্য হলে কেন দেব না!

***

ঘরে ফিরে এলাম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়াগড়ি দিলাম। মনে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। চোখের সামনে শুধু সুন্দর একটা মুখচ্ছবি ভেসে বেড়াচ্ছিল। শোয়া ছেড়ে উঠে পড়লাম। আসর আদায় করে, কয়েকজন গণ্যমান্য লোককে নিয়ে সে বাড়িতে গেলাম। বাড়ির আঙ্গিনায় পা দিতেই মেয়ের চাচার সঙ্গে দেখা হল। আমরা আগ থেকে কিছুটা পরিচিত ছিলাম। কুশল বিনিময়ের পর জানতে চাইল—

-তুমি আমাদের বাড়িতে কী মনে করে? তোমার কী খেদমত করতে পারি!

তার কাছে দুপুরের ঘটনা খুলে বললাম। দেরী না করে শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। বিবি নিয়ে ঘরে ফিরলাম। ঘরে প্রবেশের সময় মনে একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল। শুনেছি বনু তামীমের মেয়েরা খুবই কাঠখোট্টা আর রসকষহীন হয়। তাদের স্বভাবটা কেমনযেন পুরুষালি আর আবেদনহীন হয়! বিয়েটা করে ভুলই করলাম কি-না? এমন হৃদয়হীনা পাথরকে নিয়ে ঘর করব কী করে? সুন্দরী হলেই হবে? বিষে ভরা মধুকে সর্বরোগের আরোগ্য বলা বাতুলতা বৈ কি! আমি তার কাছে প্রেম নিবেদন করলাম, আর সে খেঁকিয়ে উঠল বা লাঠি হাতে তেড়ে আসল! ওহ, ভাবতেও গা শিউরে উঠছে! তবে কি ঘরে প্রবেশের আগেই তালাক দিয়ে দেব? তাহলে মোহরানা আদায়ের ধকল অনেকটা কমে যাবে? নাহ থাক না, কিছুদিন দেখা যাক, উল্টাপাল্টা আচরণ দেখলে তখন ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

***

রাত ঘনিয়ে এল। ইশার পর বাসর ঘরে প্রবেশ করলাম। সে গুটিসুটি মেরে এক কোণে বসে আছে। মনে মনে ভাবলাম, এখন যেভাবে আছ, পরেও এমন শান্তসুবোধ থাকলে হয়। তার দিকে ফিরে বললাম,

-ওহে তামীমি কন্যে! সোহাগরাতে প্রথমে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নেয়া সুন্নাত!

আমি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। সালাম ফিরিয়ে দেখি সেও নামাজে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে পারলাম সে ওজু করেই এসেছে এবং আমার নামাজের চেয়ে তার নামাজ বেশি ধীরস্থির! একটু পর বাঁদিরা এল। আমাকে আবার নতুন নওশাসাজ পরিয়ে দিল। আতর মেখে দিল। জাফরানরাঙা খুশবুদার তেল লাগিয়ে দিল। সুগন্ধে পুরো ঘরটা ম ম করতে লাগল। বাঁদিরা তাদের কাজ শেষ করে মিটিমিটি হাসতে হাসতে চলে গেল। ঘর এখন পুরোপুরি

খালি। আমার বুকটা ঢিপঢিপ করছে। হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন! ভয়ে ভয়ে আছি, সে যদি সত্যি সত্যি স্বামীদাবড়ানো বিবি হয়? কিছুটা শংকা কিছুটা আশা নিয়ে তার দিকে কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে দিলাম। হাতটা তখনো অর্ধপথও অতিক্রম করেনি তার আগেই ওপাশ থেকে একটা শব্দ ছিটকে এল,

-থামুন!

আমি মনে মনে হায় হায় করে উঠলাম! তাহলে এতদিন যা শুনে এসেছি, মিথ্যে নয়? এতরাতে আমি কী করব? রাতটা কিভাবে পার করব? বাসর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে লোকে কী ভাববে? দুষ্টু বাঁদিগুলোর টিপ্পনির জ্বলুনিইবা সইব কী করে? কেন যে মাথায় বিয়ের ভূত চাপল! পানি পান করতে গেছো, পান করতে দিয়েছে দুধ! ব্যস অমনিই তোমার মাথা ঘুরে গেল! শাদা দুধ দেখে তোমার মাথাটাও সেফ শাদা হয়ে গিয়েছিল। এর চেয়ে পানিই ভাল ছিল রে! তার চেয়েও পিপাসায় ছাতি ফেটে গেলেও আপত্তির কিছু ছিল না। এখন জানও যাবে, মোহরানা আদায় করতে গিয়ে মালও যাবে। আমি আকাশ-পাতাল ভাবছি! কিভাবে এ-দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, বাইরে গিয়ে কী অজুহাত দেয়া যায়, তখন মিষ্টি কোমল মধুমাখা একটা স্বরে সম্বিত ফিরে পেলাম!

-কী ভাবছেন অত!

-ভাবছিলাম তুমি হাতটা থামাতে বললে! রাগ করে আছ কি না!

-আমি একজন আরব মেয়ে! একজন মুসলিম। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলার অভ্যেস ছিল না। দেখা দেয়ারও সুযোগ ছিল না। তাই আপনি হাত বাড়াতে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। অজান্তেই মুখ দিয়ে শব্দটা বেরিয়ে গেছে। ক্ষমা করবেন!

-না না, ঠিক আছে! তোমার সম্পর্কে কিছু বলো! তোমাকে যে ঘরে দেখেছি, সেখানেই কি তুমি বড় হয়েছ?

-জ্বি। এখানে আমরা কয়েক পুরুষ ধরে বাস করে আসছি! আপনার সম্পর্কে কিছু বলুন!

-আমার সম্পর্কে বলার কিছু নেই। এই যা দেখতে পাচ্ছ, এটাই আমি। এর বাইরে আমার আর কোনও পরিচয় নেই!

-আমার খুব ইচ্ছা, আপনাকে ভালোভাবে জানার! যাতে একসঙ্গে বাস করাটা সহজ ও সুন্দরতর হয়ে ওঠে! বুঝ হওয়ার পর থেকে আমি কখনো

আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, এমন কিছু করিনি। আপনার সম্পর্কে বলতে গেলে আমি কিছুই জানি না। আপনার স্বভাব কেমন, আপনার পছন্দ কি, অপছন্দ কি— এ-বিষয়ে আমার কোনও ধারণা নেই। বিষয়গুলো জানতে পারলে, আমি সেমতে চলার জানপ্রাণ চেষ্টা করব। আপনার অপছন্দের বিষয়গুলোও আমার জানা থাকলে, যত কষ্টই হোক, সেগুলো পরিহার করব! ইনশাআল্লাহ!

আমি এতক্ষণ কী ভাবলাম আর মেয়েটা কী বলল! নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হল! না জেনে তার সম্পর্কে এতগুলো অমূলক ধারণা কেন করলাম! খুশি মনে তাকে একে একে আমার পছন্দ-অপছন্দের ফিরিস্তি তুলে ধরলাম! সে চুপচাপ হাঁটুতে চিবুক রেখে আমার কথা শুনে গেল। তার ব্যগ্র দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারছিলাম, আমার প্রতিটি কথা সে ভেতরে কোথাও পাথরে খোদাই করে লিখে রাখছে! মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে বক্তব্যটা একটু বেশিই লম্বা হয়ে গিয়েছিল! সেটা বেড়াল মারার মতোই হয়ে গেল প্রায়! নিজের বাহাদুরি ফলানোর সুযোগ পেলে যা হয় আরকি! মনে হতেই থেমে গেলাম! সে মুচকি হেসে প্রশ্ন করল,

-আমার একটা কথা জানার ছিল, আপনি শ্বশুরপক্ষীয় আত্মীয়-স্বজনের বেড়াতে আসা পছন্দ করেন?

-পছন্দ করব না কেন? তবে আমি কাজি মানুষ! আত্মীয়-স্বজনের কেউ সুপারিশ বা বিচারে আনুকূল্য পেতে ঘরে এসে উঠলে বিরক্তি বোধ করি!

-আচ্ছা ঠিক আছে! আপনি কি আমার প্রথম কথায় মন খারাপ করেছেন?

-না মানে, একটা ব্যাপারে আমি আগে থেকে শংকিত ছিলাম।

-কোন ব্যাপারে?

-মানে, আমাকে কে যেন বলেছিল, বনু তামীমের মেয়েরা খুবই মুখরা স্বভাবের হয়ে থাকে! স্বামীর নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়! তারা বড় কর্কশ! ইত্যাদি ইত্যাদি! সে তার বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তিও দেখিয়েছিল!

-কী যুক্তি দিয়েছিল?

-অনেক আগের কথা, আজ আর মনে নেই!

-আপনার বন্ধু আমাদের প্রতি অন্যায় ধারণা পোষণ করেছে! একটা কথা অবশ্য বলা যেতে পারে, আমাদের গোত্রের মায়েদের উদর থেকেই জন্ম নেবে শেষ জামানার সেরা মানুষগুলো। যারা মুজাহিদের মা হবেন, তারা একটু শক্তপোক্ত ডাকাবুকো হবেন, এটাই স্বাভাবিক!

- তারা কারা?

-আপনি হাদীসটা জানেন, দাজ্জালের অগ্রযাত্রা রুখে দেবে বনু তামীমের জানবাজ বীরপুরুষরা! যে মায়েরা দ্বীনের মুজাহিদ জন্ম দেবে, তাদের মধ্যে দৃঢ়তা অনমনীয়তা না থাকলে চলবে কী করে? বনু তামীমের মেয়েরা একটু স্বাধীনচেতা হয়। সেটাকেও হয়তো কেউ কেউ খারাপ চোখে দেখে! স্বাধীনচেতা মানে তারা হক কথা বলতে দ্বিধা করে না। অন্যায় দেখলে পিছিয়ে যায় না। তাই বলে স্বামীর অবাধ্যতা করবে, এমন ধারণা পোষণ করা সত্যি সত্যি জুলুম!

আমাদের বনু তামীমকে নবীজি সা. ভালোবেসেছেন। আবু হুরাইরা রা. ভালোবেসেছেন। আলি রা. ভালোবেসেছেন। প্রায় সব সাহাবীই আমাদের প্রশংসা করেছেন। আবু বকর রা. আমাদের 'কা'কা বিন আমের তামীমি সম্পর্কে কী বলেছেন সেটা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে?

'কা'কা একাই এক হাজার লোকের সমান'

সবচেয়ে বড় কথা, নবীজি সা. বেশ কয়েকবার আমাদের প্রশংসা করেছেন,

ক. বনী তামীমের লোকেরা দাজ্জালের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হবে।

খ. বনু তামীমের 'সাদাকা' নবীজির কাছে হাজির করা হলে, তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন, 'এটা আমাদের কওমের সাদাকা'। নবীজির পূর্বপুরুষ 'আদনানে' গিয়ে আমাদের বনু তামীমের বংশধারা কুরাইশের সঙ্গে মিলেছে।

গ. একবার আয়েশা রা.-এর কাছে বনু তামীমের এক যুদ্ধবন্দিনীকে আনা হল। নবীজি আয়েশা রা-কে বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও, কারণ সে ইসমাইল (আ.)-এর সন্তান!

-আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি! আর শোনো, এমন গুরুত্বপূর্ণ রাতে ঝগড়া করে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না!

-ইন্নালিল্লাহ, ক্ষমা করবেন। আমি ঝগড়া করিনি। ঝগড়া করার নিয়তে কথার উত্তরও দিইনি! আমাদের গোত্র সম্পর্কে মন্দ ধারণা করছেন, ব্যাপারটা হাদীসবিরোধী হয়ে যাচ্ছে দেখে, আপনাকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্যে এত কথা বলতে হল! আপনি একজন কাজি, আপনি কেন, কোথাকার কে-না-কে বদনামি করেছে, সেটা বিশ্বাস করতে যাবেন? আপনাকে গুনাহ থেকে বাঁচানো আমার দায়িত্ব! আর এমন চিন্তা কুরআনের

সাথেও সাংঘর্ষিক! সূরা হুজুরাতে 'মন্দ ধারণা পাপ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে!

-হয়েছে বাপু, হয়েছে! ঘাট মানছি! ভুল করে ফেলেছি! তবে নবীজি কিন্তু আমাদের ইয়ামান সম্পর্কেও প্রশংসা করে গেছেন!

- তা গেছেন! তবে আপনাদের কিন্দি গোত্র সম্পর্কে কিন্তু আলাদা করে কিছু বলে যান নি!

-ও তুমি আমাদের কিন্দি গোত্র সম্পর্কেও খোঁজ বের করে ফেলেছ?

-গোত্র সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান যে কোনও আরবেরই থাকে!

***

আমার সেই পুরনো ভয় আবার জেঁকে ধরল! আসলেই তো তামীমি কন্যারা বাচাল হয়! প্রথম রাতেই আমাকে যেভাবে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে! তার জ্ঞানের ফুলঝুরি ছুটিয়ে চলেছে, বাকি জীবন না জানি কী করে? কিন্তু আজ আমাকে জিততেই হবে! আমার রোখ চেপে গেল! বাসর-টাসর ভুলে কাছা শক্ত করে তর্ক জুড়ে দিলাম! আমার উত্তেজনা দেখে যয়নব কিছুটা কুঁকড়ে গেল! সে বারবার মাফ চাইতে লাগল! কিন্তু কে শোনে কার কথা! প্রথম রাতেই বেড়াল মারতে না পারলে, আজীবন পস্তাতে হবে! আমি তুমুল জোশ নিয়ে বললাম:

-কুরআনের প্রসঙ্গ টেনে আমাকে উপদেশ দিলে! কিন্তু কুরআনেই তো বনু তামীমকে ধমক দেয়া হয়েছে! তাদেরকে নির্বোধ বলা হয়েছে! নবীজির সঙ্গে বেয়াদবি করার কারণে!

-আপনি আমার উপর রাগ করছেন! আমার ভুল হয়ে গেছে!

-রাগ করব কেন? তোমার গোত্র নবীজির সঙ্গে বেয়াদবি করেছে!

-এটাও আপনার ভুল ধারণা! ব্যক্তিগত কিছু হলে আমি চুপ করে থাকতাম! কিন্তু এটা কুরআন কারীম সম্পর্কিত! ঈমানের অংশ! চুপ থাকলে আমাদের দু'জনেরই গুনাহ হবে! আপনি যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছেন, সেটা ঘটেছে 'আমুল উফুদ' (প্রতিনিধি) আগমনের বছর। বনু তামীমের লোকজন ভরদুপুরে মদীনায় পৌঁছেন। নবীজি তখন হুজরায় বিশ্রাম করছিলেন। বনু তামীম মদীনায় এসেছে ইসলাম গ্রহণ করতে। সত্যের সন্ধানে। তারা মরুভূমির-লোক। আল্লাহর নবীর সঙ্গে কেমন আদব-লেহাজ নিয়ে কথা বলতে হয়, সেটা জানতো না। তাই হুজরার সামনে

গিয়ে জোরে হাঁক দিয়ে নবীজিকে ডাকতে শুরু করলো। ব্যাপারটা আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হলো না! সাথে সাথে ওহী নাযিল করলেন—

-(হে রাসূল!) যারা আপনাকে হুজরার বাইরে থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধি নেই। -হুজুরাত (৪৯:৪)

-তাহলে স্বীকার করে নিচ্ছ, তোমাদের বুদ্ধি কম!

-জ্বি। তবুও আপনি খুশি থাকুন! তবে তাদের এই আচরণটা ছিল ইসলাম গ্রহণের আগে!

-তোমাদের বাপ-দাদারা কিন্তু নবীজির সঙ্গে কবিতা নিয়েও দ্বন্দ্ব লাগিয়েছিল! পরে হাসসান বিন সাবিত রা.-এর সামনে তামীমি কবিরা ভেজা বেড়ালে পরিণত হয়েছিল! কবিতাযুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর, ইসলাম গ্রহণ করেছে!

-আপনি আবারও সত্যকে উল্টো করে দেখছেন! হাসসান বিন সাবিত রা. বনু তামীমের কবিদের কবিতার জবাবে স্বরচিত কবিতা পড়লেন, তখন সবাই একবাক্যে বলে উঠেছে, নবীজির কবি আমাদের কবির চেয়ে সেরা। এখানে হার-জিতের প্রশ্ন আসছে কেন! আর নবীজির প্রিয় কবির কবিতা তো সেরা হবেই! তাই বলে কি আমাদের তামীমি কবিরাও খারাপ কবিতা বলেছে! মিলিয়ে দেখুন! হাসসান রা.-এর কবিতা আমাদের তুলনায় অবশ্যই ভালো— এটা অস্বীকার করছি না; কিন্তু আপনি ইনসাফের দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে, আমাদের কবিদের খারাপ মনে হবে না! শুরুতে বনূ তামীমের একজন বক্তব্য দিয়েছিল, তার জবাবে নবীজি খাযরাজ গোত্রের সাবেত বিন কায়সকে খোতবা দিতে বলেছেন। আমাদের চেয়ে সাবেতের খুতবা বেশি সুন্দর হয়েছিল!

-তাহলে স্বীকার করছ, তোমরা ভাষায় দুর্বল!

-আপনি আমার উপর রাগ করছেন, আমি তো কিছুই দাবি করিনি! আপনি আমার মুরুব্বি! আপনার কথা আমি শরীয়তের সীমার মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব! তাই আবারও আপনাকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্যে একটু কথা বলতে হচ্ছে! বনূ তামীম সম্পর্কে আপনি কেন এত রাগ পুষে রেখেছেন, জানি না! আপনি এইমাত্র বললেন, আমরা ভাষায় দুর্বল! এটাও কিন্তু কুরআনবিরোধী কথা হয়ে গেল!

-আবারও আমাকে কুরআনবিরোধী বানিয়ে ফেললে? কিভাবে বল তো?

-কুরআন কারীম আরবের কয়েকটা গোত্রের 'লাহজা' বা কথ্যরীতিতে পড়া যায়। বনু তামীমও সেসব গোত্রের একটা। এটা এক দুর্লভ সম্মান ও স্বীকৃতি। শুধু তাই নয়, নবীজি বনু তামীমকে সম্মান করেছেন। কবিতার ঘটনার দিন প্রতিনিধি দল মদীনা থেকে ফেরার সময় তিনি সবাইকে অনেক অনেক হাদিয়া দিয়েছেন। দু'আ করেছেন। আবার আল্লাহ তা'আলাও আমাদেরকে বিরল সম্মানে বিভূষিত করেছেন।

-বিরল সম্মান? সম্মান কোথায় দেখলে? তিনি তো তোমাদেরকে বোকা সাব্যস্ত করেছেন!

-আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে আমাদের গোত্রের একান্ত নিজস্ব কিছু শব্দকে ব্যবহার করেছেন,

১. (الصدف) পাহাড়ের প্রান্ত।
২. (الحُبُكِ) মেঘের গতিপথ। তারকারাজির কক্ষপথ।
৩. (بغي) হিংসা।
৪. (قرح) যখম।
৫. (تدَخرون) দালের উপর তাশদীদ পড়াটা বনু তামীমের রীতি।

আরও আছে! আচ্ছা এসব আজ রাতের জন্যে থাকুক না! এসব আলোচনা করার জন্যে সারা জীবন সামনে পড়ে আছে! আমি আপনার মনে অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলেছি! আমি কথা বলতে চাইনি! শুধু কুরআন কারীম আর হাদীস শরীফের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু দেখলেই মুখ খুলেছি! আমি একজন সাধারণ মেয়ে! আপনি কত বড় কাজি! আপনার সঙ্গে আমার ঘর করা দূরের কথা, কথা বলারও যোগ্যতা নেই! আপনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন, এটা যে আমার জন্যে কতবড় সৌভাগ্যের বিষয়, তা বলে বোঝাতে পারব না!

***

যয়নবের কথা শুনে আমার ভেতরটা অনুশোচনায় ভরে গেল। আমি যে একটা হীরের টুকরা জীবনসঙ্গী পেয়েছি, সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করলাম। এতক্ষণ আমি জ্ঞানের গরিমায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। একটা পুঁচকে মেয়ে আমার সঙ্গে জ্ঞানগর্ভ তর্ক করতে আসবে, এটা ছিল আমার কাছে কল্পনাতীত বিষয়! একটা সদ্য যৌবনবতী বালিকা আমার প্রতিটি কথা কুরআন-হাদীস দিয়ে ভুল প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবে, এটা ছিল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। একটা মেয়ে এত অল্প বয়েসে এত কিছু শিখে গেছে?

আমার মধ্যে কোত্থেকে যেন রাজ্যের আবেগ এসে ভর করল! যয়নবের হাত ধরে গদগদ স্বরে বললাম—

-তুমি আমার জন্যে সত্যি সত্যি তামীমা (রক্ষাকবচ) হয়ে এসেছ! আজ দুপুরে তোমার ঘরের দুধ খেয়ে পিপাসা মিটিয়েছি! বাকী জীবন তোমার জ্ঞানসাগরে ডুবে ডুবে জল খেয়ে যাব!

-যাহ, কিভাবে যে কথা বলেন!

-ওহো ভুলে গেছি, তোমার সঙ্গে সাবধানে কথা বলতে হবে! ভাষাগত ভুল হয়ে যায় কি না? তোমরা তো কুরআনের ভাষায় কথা বলো!

-আপনি এখনো আমার প্রতি রাগ করে আছেন!

-রাগ করব কেন, তোমাকে রাগানোর চেষ্টা করছি; কিন্তু সফল হতে পারছি না! এত কথা বললাম একটুও রাগলে না, উল্টো আমাকেই রাগিয়ে ছাড়লে!

-ভুলের জন্যে আবারও ক্ষমা চাইছি!

-না না, তুমি কোনও ভুল করোনি। বাকী জীবন যখনই আমার কথায় বা কাজে কুরআন-সুন্নাহবিরোধী কিছু দেখবে, সাথে সাথে বলে দেবে! আমার রাগের ভয় করবে না!

-আপনি আমার সম্পর্কে বেশি সুধারণা করে ফেলছেন! আমি নিতান্ত অজ্ঞ একটা মেয়ে! লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয়া মেয়ে!

(আমি মনে মনে বললাম, বা রে! ফাঁকি দিয়ে লেখাপড়া করার পর যদি এ-অবস্থা হয়, ভালভাবে পড়লে না জানি কী অবস্থা দাঁড়াত! যেভাবে বাসর রাতেই বেড়ালের জায়গায় বাঘ মেরে ফেললে, না জানি ভবিষ্যতে আরও কত কি মারো!)

-আচ্ছা, ঠিক আছে তুমি ফাঁকিবাজ মেয়ে! তবে আমাকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে ফাঁকি দিলে চলবে না!

-একদম ফাঁকি দেব না! ইনশাআল্লাহ! আমার পুরো সময়টাই আবর্তিত হবে আপনাকে ঘিরে! ছোটবেলা থেকেই আম্মু আমাদের বোনদেরকে বারবার এ-শিক্ষা দিয়ে বড় করেছেন!

-তাহলে এবার হাত বাড়াই! তুমি কি বল?

-আপনি ....!

***

জীবনের সেরা একটা রাত কাটল। কোন ফাঁকে দীর্ঘ একটা রাত কেটে গেল টেরও পেলাম না। তামীমির নেশায় তিন দিন বুঁদ হয়ে থাকলাম।

চতুর্থদিন কোর্টে গেলাম। কাজ শেষে দ্রুত ঘরে ফিরলাম। যতই দিন গড়াতে লাগল, পরের দিনটা আগের দিনের চেয়ে বহুগুণ সুন্দর, অর্থবহ আর স্বপ্নীল হয়ে উঠতে লাগল! তামীমার প্রতি মুগ্ধতার রেশ বেড়েই চলছে! প্রতিদিনই তার কোনও না কোনও নতুন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ছে! মেয়েটা হীরের খনি হয়ে এসেছে আমার জীবনে! যতই খুঁড়ি, যতই গভীরে যাই, আরও দামী দামী রত্ন আবিষ্কৃত হতে থাকে!

***

সুখের দিনগুলো দ্রুতই কেটে যায়। সুখের সংসারের বয়েস দাঁড়াল এক বছর। এতদিন পর আমার শাশুড়ি মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। আমি যথাসাধ্য যত্নআত্তি করার চেষ্টা করলাম। যে মা এমন অসাধারণ একটা মেয়ে জন্ম দিতে পারে, তাকে শ্রদ্ধা করা ফরজের পর্যায়ে পড়ে।

বুড়িমা একফাঁকে আমাকে আড়ালে ডেকে ফিসফিস করে বলল—

-আমার মেয়েকে কেমন পেলে?

-সুবহানাল্লাহ! আপনি আমাকে একটা জান্নাতি হুর উপহার দিয়েছেন। কন্যাকে আদর্শরূপে গড়ে তোলার জন্যে একজন মায়ের যা যা করা দরকার, তার চেয়েও বেশি করেছেন আপনি। মেয়েকে যতকিছু শেখানো দরকার, কিছুই বাকি রাখেন নি। আদব-লেহাজ, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ঘর-সংসার, ভদ্রতা-সহবত কোন দিক দিয়ে তার ভুল ধরব?

-বাছা, এত মুগ্ধ হয়ো না! আরও কিছুদিন যাক, তখন বোঝা যাবে, সে কেমন। একটা মেয়ে ভাল বলে পরিচিতি পেয়ে গেলে, তার আসল রূপ বের হয়ে আসে দুই পরিস্থিতিতে।

ক. স্বামীর আদর-যত্ন পেয়ে মেয়েটা স্বামীর প্রতি আরও বেশি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছে নাকি লাই পেয়ে মাথায় উঠেছে? এক্ষেত্রে তার স্বভাবের পরীক্ষা হয়ে যায়।

খ. তার সন্তান হওয়ার পর সে মা হিশেবে কেমন? সবর-শোকরের পরিচয় দিয়েছে? এক্ষেত্রে আত্মিক শক্তির পরিচয় বের হয়ে আসে।

***

শাশুড়ি বছরে একবার বেড়াতে আসতেন। বেড়ানো শেষে ফিরার সময়, পরের বার আসতে পারবেন কি না, আমার কাছে তার অনুমতি চাইতেন! আমি ভীষণ অবাক হতাম, তার এই অদ্ভুত অভ্যেস দেখে! তাকে বলতাম,

-আপনি মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসবেন, এতে আমার অনুমতি লাগবে কেন? এটা আপনারও ঘর!

-না বাছা, অনুমতি নেয়া জরুরী! আমি মেহমান! মেজবানের সম্মতি ছাড়া, মেহমানের ঘরে পা দেওয়া ঠিক নয়! মেজবান যতই আপন হোক! এমনকি পেটের ছেলে আলাদা সংসারে থাকলে, তার বাড়িতে যাওয়ার আগেও অনুমতি নিয়ে নেওয়া উচিত!

প্রতিবারই যাওয়াই আগে মেয়ে সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। আমার উত্তর শুনে বলতেন,

-যখনই তার মধ্যে উল্টাপাল্টা কোনও আচরণ দেখবে, কঠোর হাতে শাসন করবে! কারণ যে মেয়ে স্বামীর আদর পেয়ে আরও বাঁদর হয়, লাঠিই তার একমাত্র প্রতিষেধক!

***

আমি একটানা বিশ বছর যয়নবের সঙ্গে ঘর করেছি। কখনো তার আচরণে দোষ ধরার মত কিছু পাইনি। আমি রাগ করার মতো কোনও উপলক্ষ্য তৈরী হয়নি।

***

ঘটনাটির আলোকে অভিজ্ঞজনেরা কিছু বিষয় তুলে ধরেন,

(১) একজন স্বামীকে সুখী হতে হলে, তাকে অবশ্যই প্রকৃত ধার্মিক হতে হবে। ধর্মপালনে যত্নবান থাকতে হবে।

(২) বিয়ের বয়েস হলে, পছন্দসই মেয়ে পেলে, দ্রুত বিয়ে করে ফেলতে হবে। না হলে ফিতনার আশংকা থেকে যায়।

(৩) শুধু পছন্দ হলেই হবে না, মেয়ে সম্পর্কে, মেয়ের পরিবার সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর যাচাই বাছাই করে নিতে হবে।

(৪) আল্লাহ তা'আলার উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখতে হবে। ভবিষ্যতের খাওয়া-পরা নিয়ে অমূলক ভয় দূর করে দিতে হবে। বিয়েটা বরকতপূর্ণ হবে, এ দৃঢ়বিশ্বাস সব সময় মনে হাজির-নাজির রাখতে হবে।

(৫) বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান পুরোপুরি সুন্নাত তরিকায় হতে হবে। বিয়ের পর স্ত্রীর সঙ্গে ওঠাবসা-কথাবার্তাও পুরোপুরি সুন্নাত তরিকায় হতে হবে।

(৬) প্রথম প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে তোলার জন্যে অনেক ছাড় দিতে হবে। পারস্পরিক অপরিচিত ভাব দূর করার জন্যে সময় দিতে হবে।

(৭) শুধু স্ত্রীই সাজগোজ করবে, এমন নয়। নিজেও সাজগোজ করবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।

(৮) দু'জনেই বেগানা নারী-পুরুষের দিকে তাকাবে না। দু'জনেই নজরের হেফাজত করে চললে, সংসারে অশান্তি প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

(৯) স্ত্রী সংসারের কাজে শুধু মন নয়, মাথাও যথাসাধ্য ব্যবহার করবে। একজন পুরুষের সঙ্গে জীবন কাটাতে হলে, চপলমতি হলে চলে না, বুদ্ধিমতী হতে হয়।

(১০) দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়াটা গভীর হওয়া জরুরী। বৈবাহিক জীবনের শুরু থেকেই। তাহলে সংসারে স্থিতিশীল অবস্থা বজায় থাকবে। সংসার থাকবে ঝগড়া-বিবাদমুক্ত। এটা অর্জিত হতে পারে স্বামীর কিছু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপে।

ক. শুরুতেই স্বামী জানিয়ে দেবে, স্ত্রীর মধ্যে কোন কোন অভ্যেস থাকাটা সে অপছন্দ করে।

খ. কোন কোন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা তার পছন্দ নয়। নিজের ঘরে কারা আসবে, কারা আসবে না, এটা নিয়ন্ত্রণ করা একজন পুরুষের অধিকারের মধ্যে পড়ে।

(১১) স্ত্রী সবসময় চেষ্টা করবে, স্বামীর পছন্দমত খাবার রান্না করতে, স্বামীর পছন্দমত পোশাক পরতে, স্বামীর অপছন্দনীয় বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে।

(১২) স্বামী যখন কথা বলবে স্ত্রী মনোযোগ দিয়ে শুনবে। বোঝার চেষ্টা করবে। না বুঝলে জিজ্ঞেস করে বুঝে নিবে। পরে বাস্তবায়ন করবে।

(১৩) স্বামী কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনও আদেশ না করলে, স্ত্রী যুক্তি-তর্ক ছাড়াই আদেশ মেনে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

(১৪) স্ত্রীর পরিবার-পরিজনকে যথাযথ মর্যাদা-কদর করবে। যথাসাধ্য তাদের আদর-আপ্যায়ন করবে। তার মানে এই নয়, স্বামীর উদারতার সুযোগে, স্ত্রীপক্ষের আত্মীয়-স্বজন জামাইয়ের ঘাড়ে চেপে বসবে। যখন-তখন বেড়াতে চলে আসবে। বাপের বাড়ির দিক থেকে কারো আসার প্রয়োজন হলে, স্বামীকে আগেই জানিয়ে রাখবে। অনেক স্বামী আছে, নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করে। ছোট্ট ঘরে শ্বশুরপক্ষীয় কেউ এলে ঝগড়ার ভয়ে চুপচাপ মেনে নিলেও, ভেতরে চাপা অস্বস্তি থেকে যায়। ঘরদোর সঙ্গতিতে প্রাচুর্য থাকলে এসব সমস্যা থাকে না। তখন উল্টো শ্বশুরপক্ষের কেউ বেড়াতে এলে স্বামী খুশিই হয়।

(১৫) মেয়ের উপর একজন যোগ্য মায়ের প্রভাব বিয়ের পরও অটুট থাকে। একজন অভিজ্ঞ মা বিয়ের পরও মেয়ের সংসারের দিকে একটা নিরপেক্ষ চোখ রাখেন। মেয়ের দাম্পত্যজীবন সুখী করে তোলার লক্ষ্যে নিরবে কাজ করে যান। একজন বুদ্ধিমতি মা তার কন্যাকে সুখী করে তুলতে গিয়ে, তার সংসারে অযাচিত হস্তক্ষেপ করেন না। মেয়ের কথা শুনেই তাল দিয়ে জামাইকে দোষারোপ শুরু করেন না। জামাইয়ের সঙ্গেও কথা বলেন। সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমাধানের পথ

খোঁজেন। মেয়েকে অযৌক্তিক উস্কানি দিয়ে, তার সংসার দোযখ করে তোলেন না। একজন অভিজ্ঞ মা জানেন, অধিকাংশ মেয়ের সংসারে আগুন জ্বলে, মেয়ের মা ও বোনের ভুল আচরণের জের ধরে! অনভিজ্ঞ পরামর্শের কারণে! অবিবেচনাপ্রসূত বুদ্ধিপ্রদানে!

(১৬) কুরআন কারীম চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রয়োজনে স্ত্রীকে প্রহার করার অনুমতি দিয়েছে। তার মানে এই নয়, যখন তখন এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা যাবে। কুরআন কারীমের আলোকে, ফকীহগণ এ-ব্যাপারে যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, স্বামী পুরোপুরি তার উপর আমল করবে।

(১৭) মেয়েকে ছোটবেলা থেকেই সচেতনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাওয়া আবশ্যক। কিভাবে ঘরের দায়িত্ব পালন করবে। কিভাবে ক্রোধ দমন করবে। কিভাবে তর্ক এড়িয়ে যাবে। কিভাবে চুপচাপ কথা শুনবে। স্ত্রীর মাঝে স্বামীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার অভ্যেস থাকতে হবে।

(১৮) স্বামী ও স্ত্রী দু’জনেই যদি নিজের দায়িত্ব ও অধিকারের সীমা বুঝে চলে, সংসারে দুর্দিন আসার সুযোগই পাবে না।

(১৯) স্বামীর উচিত স্ত্রীর প্রতি সবসময় অতি নমনীয় আচরণ না করা। স্ত্রীর ভুল বা অন্যায় দেখলে চুপ করে না থাকা। অনেক সময় স্বামীর চুপ থাকাটা বা নমনীয় স্বভাবের কারণে, স্ত্রীর মধ্যে অহংকারপ্রবণতা চলে আসে। পরিণতি সুখকর হয় না।

(২০) পুরুষ ঘরে সুখী হলে, বাইরে কর্মক্ষম থাকে। স্ত্রীর কর্তব্য হল, স্বামীকে ঘরে সুখী করে তোলা! স্বামীর কর্তব্য হল, স্ত্রীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা।

তালাক

মহিলাটা আর থাকতে না পেরে জজ সাহেবের বাসা পর্যন্ত গিয়েছে। জজের স্ত্রীর কাছে অভিযোগ তুলে ধরেছে। স্বামী তাকে মারে। লোকটা আবার কৃপনও। টাকা-পয়সা না থাকলে কোনও কথা ছিল না। পকেটভর্তি টাকা থেকেও কেন কৃপনতা? কাযী সাহেব স্ত্রীর কাছ থেকে সব শুনলেন। খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না। মেয়েটা মরিয়া! নিজে কিছু করতে না পেরে, বাবাকে দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা ঠুকল।

বিচারক এবার আর পিছিয়ে যেতে পারলেন না। তাকে একটা বিহিত করতেই হবে। ফয়সালা না দিয়ে উপায় নেই। বিচারক ব্যক্তিগতভাবে

খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, এটা বিচ্ছেদের মামলা হতেই পারে না। বড়জোর খোরপোষের মামলা হতে পারে। মেয়ের বাবাকে বললেন— আপনাকে একটা কাগজ দিচ্ছি, কোর্টের সিল মারা। আপনি মেয়েকে কাগজটা দিয়ে বলবেন, তার স্বামীর কি কি দোষ আছে, সেগুলো এখানে লিখে দিতে।

মেয়ে অবাক! কাগজ-কলম দিয়ে কী হবে?

-কাজি সাহেব তোকে জামাইয়ের কি কি দোষ আছে, লিখে দিতে বললেন। মানে তুই কেন তালাক চাচ্ছিস?

মেয়ে একটু ভেবে লিখে দিল,

ক. মাঝেমধ্যে আমার গায়ে হাত তোলে।

খ. লোকটা কৃপণ।

বিচারক কাগজটা দেখলেন। আরেকটা কাগজ দিয়ে বললেন,

-এটাতে স্বামীর কোনও গুণ থাকলে সেটা লিখবেন। আগামীকাল রায় দেব।

পরদিন মেয়ে শাদা কাগজ জমা দিল।

-কোন গুণই নেই?

-তেমন কিছু মনে আসেনি। অনেক ভেবেছি।

-তাহলে গায়ে হাত তোলা আর কৃপনতার কারণে তুমি তালাক চাচ্ছ?

-জ্বি। অন্য কোনও মেয়ে কি এমন লোকের সঙ্গে ঘর করতে রাজি হবে? পিঠে ব্যথা আর পেটে ক্ষুধা নিয়ে?

-বলো কি, সে প্রয়োজনীয় খাবার-দাবারও দেয় না?

-তা দেয়!

-তার কোনও গুণই নেই?

-অনেক ভেবেছি, না পেলে কী করব?

-তোমাদের সংসার কত দিনের?

-বারো বছরের।

-তোমাদের কয় সন্তান?

-চারজন।

-তোমার স্বামী কী করেন?

-তেল কোম্পানিতে চাকুরি করেন।

-বেতন?

-পনেরশ রিয়াল!

-সে বাসায় ফেরে কখন?

-বিকেলে। সবাই যখন ফেরে। তখনই সমস্যা দেখা দেয়।

-সমস্যা? সেটা কী? তোমার গায়ে হাত তোলে?

-জ্বি না, বাসায় ফেরার পর থেকেই বাচ্চাদের সঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি করে খেলাধুলা শুরু করে দেয়। বাসায় তিষ্টানো দায় হয়ে পড়ে।

-কী বলছ তুমি! এটাকে সমস্যা বলছ?

-আমি জানি, বাবারা সন্তানের সঙ্গে এভাবে শিশুর মতো খেলাধুলা করে না। তাহলে সন্তানগুলো বেয়াদব হয়ে বেড়ে ওঠে!

-তুমি ভুল শুনেছ! এই নাও কাগজ। নম্বর দিয়ে লেখো, আমার স্বামী নিয়মিত সন্তানদের সঙ্গে খেলাধুলা করে।

বিচারক আলাপ চালিয়ে গেলেন। জানতে পারলেন, গত গ্রীষ্মে পুরো পরিবার তুরস্কে বেড়াতে গেছে।

-পুরো পরিবার নিয়ে বেড়াতে গেছে তুরস্কে! এটা তো অনেক বড় গুণ! লেখো। কৃপণ লোক জমানো টাকা খরচ করে আরেক দেশে বেড়াতে যাবে, এটা কেউ বিশ্বাস করবে?

এভাবে বের হতে হতে স্বামীর বারোটা গুণ বের হয়ে এল। কাজি সাহেব প্রশ্নোত্তরপর্ব স্থগিত করে, মেয়ের বাবার হাতে দুটো কাগজ তুলে দিলেন। দেখুন, দোষ আর গুণগুলো তুলনা করে। দুটো দোষ বিপরীতে বারোটা গুণ।

-তুমি কি এখনো তালাক চাও?

-আমি কী বলবো, বুঝতে পারছি না। কিন্তু সে আমাকে মারে! সে কৃপন! তার সঙ্গে ঘর করা অনেক কষ্টের!

-গায়ে হাত তোলা আর কৃপনতার জন্যে চিকিৎসা আছে। তালাকের মতো চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে হবে কেন? তুমি জানো তালাক হলে, চারটা সন্তানের উপর কী খারাপ প্রভাব পড়বে? সামাজিক ও পারিবারিকভাবে কত সমস্যা তৈরি হবে?

-আমাকে একটু ভাবার সময় দিন!

কাজি সাহেব বলনে—

-মহিলা আর আসেনি। নিশ্চয় সে সিদ্ধান্ত বদলেছে। সে এতদিন শুধু স্বামীর মন্দ দিকগুলোই দেখেছে। মানুষের স্বভাবই এমন।

= জগতের সকল দম্পতি সুখী হোক! =

maktabatulazhar@yahoo.com
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র ▸ ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২। ০১৯২৪০৭৬৩৬৫
বাংলাবাজার শাখা ▸ ১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ০১৭১৫০২৩১১৮